ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা এবং নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও পৌত্তলিকতা খণ্ডন বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৬ শকাব্দ, ৫৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

বিজ্ঞাপন।

"ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত পাঁচটী প্রবন্ধ, গত বর্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ পূর্ব্বে কোন কোন সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলিতে এক দিকে যেমন অনীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডিত অন্য দিকে সেইরূপ পৌত্তলিকতার অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে যেমন এক শ্রেণীর লোক নাস্তিকতার পোষকতা করিয়া সকল ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ আর এক শ্রেণীর লোক দেশ-প্রচলিত জরাজীর্ণ উপধর্ম্মের স্থায়িত্ব সম্পাদনে প্রয়াস পাইয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছেন। পুস্তক খানিতে এই উভয় শ্রেণীভুক্ত লোকের অসার ও অনিষ্টকর মতের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে ইহা বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তকের ২য় ও ৩য় খণ্ডে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান বিষয় সকল বিবৃত হইবে।

কলিকাতা।
মাঘ, ৫৬ ব্রাহ্মাব্দ।

প্রকাশক।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়।

এক্ষণে জনসমাজের পরিবর্ত্তনের অবস্থা। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে প্রাচীন কুসংস্কার স্থান পাইতেছে না। পিতৃপুরুষেরা আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিযাছেন, এক্ষণে নব্যদল তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমের নূতন আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া চিরপূজিত তেত্রিশকোটী দেবতা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

কেবল আমাদের দেশেই এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে, এমন নহে। সমগ্র সভ্য জগতেরই এই অবস্থা। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিসম্বাদ। যাহা এতকাল পরমারাধ্য দেবতা ছিল, জ্ঞানের উজ্জ্বল দণ্ডস্পর্শে, এখন তাহা মনুষ্য, জড় বা জড়ীয় শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র বা অভ্রান্ত মহাপুরুষের ভ্রান্তি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম সকল, ভ্রমপ্রমাদের সহিত জড়িত দেখিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধর্ম্মেরই উপর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিত্তিমূলস্বরূপ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সত্যে অনেক বুদ্ধিমান্ লোক সংশয় প্রকাশ করিতেছেন।

ইংলণ্ডে কোন কোন প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি গ্রন্থাদিতে সংশয়-বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত এক্ষণে ভারত-বর্ষের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে ইংলণ্ডে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষে তাহার প্রতিধ্বনি হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে যে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা প্রকাশ পাইতেছে, সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া তাহা নব্যদলে প্রবেশ করিতেছে।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, এদেশে এখন এমন লোক বিরল নহে। এ জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, কে বলিল? তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? পরমেশ্বরের সত্তার কোন প্রমাণ নাই, এ কথা যে কেবল সংশয়বাদীরাই বলেন, এমন নহে। অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তিও বলেন, "বিশ্বাস করি ভগবান্ আছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।" "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু; তর্কে বহুদূর।"

কিন্তু বাস্তবিক কি পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই? আমি এরূপ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি।

পরমাণু ও কৌশল।

কিন্তু সন্দেহবাদী বলিবেন, "জড় পরমাণুর সংযোগ বিয়োগে জগৎ সংগঠিত হইয়াছে, বলিলেই হয়। এক-জন জ্ঞানসম্পন্ন স্রষ্টা আছেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন কি?"

এই পরমাশ্চর্য্য কৌশল পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কি অন্ধ জড়পরমাণু বা জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? কৌশলে জ্ঞান

প্রকাশ পায়। বুদ্ধিশূন্য, চেতনাবিহীন জড়পরমাণু কি এই সুরবগাহ কৌশলপরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে?

এ জগৎ কৌশলময় একটি অদ্ভুত যন্ত্র; সুতরাং কৌশলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল সকল ব্যাখ্যা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত যেমন প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ, সেইরূপ এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রেরও প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের যোগ রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, যে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের কিরণ সৃষ্টিকাল হইতে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াও অদ্যাবধি পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই,—তাহারও সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে। সমগ্রভাবে সমুদয় বিশ্বের বিষয় আলোচনা কর, অথবা ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব চিন্তা কর, যে ভাবে কেন দেখ না, ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরমাশ্চর্য্য কৌশল নিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়া থাকিবে। * ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, সামান্য তৃণখণ্ড হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, অদৃশ্যপ্রায় বালুকণা হইতে, অত্যুচ্চ হিমাচল পর্য্যন্ত, সামান্য শিশিরবিন্দু হইতে

---

* তর্কশাস্ত্র ও কঠোর দর্শনের আলোচনা করিয়া [illegible] হৃদয় এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, এই অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আশ্চর্য্য রসে বিগলিত হয় না। মহাত্মা কার্লাইল এই প্রকার লোকের বিষয়ে বলিয়াছেন;—"The man who cannot wonder, who does not

সুবিশাল সমুদ্র পর্য্যন্ত, সমুদয় পৃথিবী এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। নিম্নে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী যে জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত-লোকমণ্ডলে সেই পবিত্র সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি হইতেছে।

বিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অসংখ্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান প্রদর্শিত কৌশলরাশির আলোচনা ভিন্ন যে, এ বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় না এমন নহে। সর্ব্বদা সহজে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে সকল পদার্থ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, অভিনিবিষ্টচিত্তে সেই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ।"

এই যে দেহ আমরা ধারণ করিতেছি, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার! বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া অথবা সহজ বুদ্ধিতে, যেরূপেই হউক আলোচনা কর, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ তোমার নিকট তাহার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে।

---

habitually wonder (and worship), were he president of innumerable Royal Societies and carried the whole *Mecanique Celeste* and *Hegel's philosophy* and the epitome of all Laboratories and Observatories with their results, in his single head,—is but a Pair of Spectacles behind which there is no Eye. Let those that have Eyes look through him, then he may be useful."

সৃষ্টি-কৌশল।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তর (ডাক্তর বেলি) বলিয়াছিলেন, "আমি মনুষ্যদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার।

বর্ত্তমান সময়ে সন্দেহবাদীদিগের শিরোভূষণ জনষ্টুয়ার্টমিল্ বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তি যেমন অনেক স্থলে সামান্য, সেইরূপ আবার অন্যান্যস্থলে, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশলসম্বন্ধে ইহার বল অত্যন্ত অধিক। ‡

বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার জ্ঞান প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বদা সকলের নয়নপথে যে সকল প্রাকৃতিককার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে, অভিনিবিষ্টচিত্তে সে সকলের আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরমেশ্বরেয় দেদীপ্যমান জ্ঞানসঙ্কল্প হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। সহজবুদ্ধিতে যাহা অনুভব করিতে পারি, বিজ্ঞান তাহা শতগুণে দৃঢ়ীকৃত করিয়া দেয়।

ভাব দেখি, কেমন করিয়া মাতৃগর্ভে জীবের সঞ্চার হয়। কেমন করিয়া সেখানে সে পরিপুষ্ট ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভূষিত

---

* "I have examined the human frame through and through, and I see it is a miracle we live."

‡ "An argument which is in many cases slight, but in others and chiefly in the nice and intricate combinations of vegetable and animal life, is of considerable strength." *Three Essays on Religion.*—J. S. Mill.

হইয়া উপযুক্ত সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়! ভাবিলে কি আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হও না? যে অদ্ভুত কৌশলে তুমি আমি এ সংসারে আসিয়াছি, তাহা কি অন্ধ জড়পরমাণুর কার্য্য?

ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হওয়া যায়, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল প্রসবসম্বন্ধীয় একটি বিষয় বলিব।

মনে কর, একটি জঙ্গলময় সংকীর্ণ পথ দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে, পথের অবস্থা যেখানে যেমন, তোমার শরীরকেও সেখানে সেই ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। মনে কর, একস্থানে একটা বৃক্ষের শাখা নিম্নেরদিকে নত হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থানে তুমি কথনই মস্তক উচ্চ করিয়া গমন করিতে পারনা; অবনত মস্তকে যাইতে হইবে। মনে কর, আর এক স্থানে দুই দিক্ হইতে বৃক্ষশাখা সকল পতিত হইয়া পথ এরূপ সংকীর্ণ করিয়াছে, যে সোজা চলিতে হইলে তোমার দুই স্কন্ধে বাধিবে। সেখানে তুমি কি করিবে? তোমার মুখ ও সমস্ত শরীর ফিরাইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতে হইবে।

মাতৃগর্ভে প্রসবকালে অবিকল তাহাই ঘটে। প্রসবপথের যে স্থান যে প্রকারে সংগঠিত, মাতৃগর্ভস্থ অদৃশ্য শক্তিদ্বারা শিশুশরীর সেখানে সেই ভাবে সংস্থিত হয়; নতুবা প্রসব কার্য্য অসম্ভব হইত? প্রসবপথে স্থানবিশেষে যখনই শিশুর স্কন্ধদ্বয় আটকাইয়া যায়, তখনই গর্ভস্থ শক্তি দ্বারা উহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন (rotation) হয়, এবং শিশু সহজে গম্যস্থানের দিকে

অগ্রসর হইতে থাকে। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মাতৃগর্ভস্থ শক্তি যদি অন্ধ শক্তি হয়, তাহা হইলে উহা কেমন করিয়া জানিল যে, শিশুর পক্ষে প্রসূত হওয়া আবশ্যক? উহা কেমন করিয়া জানিতে পারে যে, প্রসবপথের স্থান বিশেষে শিশুর শরীর আটকাইয়া যায়? কেমন করিয়াই বা জানিতে পারে যে, শিশুর শরীরকে বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিলে উহা সহজে নির্গত হইতে পারিবে? ইহাই কি জ্ঞানচৈতন্যবিহীন অন্ধ শক্তির কার্য্য?

অন্ধ শক্তি ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি।

এক জ্ঞানময়ী শক্তি যে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের কারণ,একটি বিষয় আলোচনা করিলে তাহাতে আর লেশমাত্র সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। উপস্থিত অভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার পূরণ করিলে, সে কার্য্যে আমরা বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু যখন কেহ ভাবী অভাবের বিষয় পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য উপযুক্ত আয়োজন করেন, তাঁহার কার্য্যে আমরা অনেক গুণে অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রকৃতির মধ্যে এই শেষোক্ত প্রকার কার্য্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ কুলায়স্থিত ডিম্বটীর বিষয় ভাব দেখি। ঐ ডিম্বের অভ্যন্তরে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে,উহা কি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতেছে না? যাহাতে ভবিষ্যতে একটি

পক্ষীশাবক উৎপন্ন হইতে পারে, উহার পরমাণু সকল কি এখন হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে না? তুমি একটি সুস্বাদু সুপক্ক আম্রফল পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলে। কিন্তু উহার সকল অংশ আহার কর, তোমার এমন সাধ্য নাই, ইচ্ছাও নাই। ফলের ভিতরে একটি আঁটি রহিয়াছে। উহা কেন? প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, উহা কি কেবল তোমার আমার জন্য? বর্ত্তমান বংশের জন্য কার্য্য করিতেছে না? ভাবীবংশীয়দের জন্যও কার্য্য করিতেছে। তুমি আমি আম্র ফল ভোজন করিয়া সুখী হই, প্রকৃতির অন্তর্ভূতা শক্তি কেবল ইহাই চাহে না। আমাদের পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি ভাবীবংশীয়েরা যাহাতে সুমিষ্ট রসাল সেবন করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে। ফলের যে অংশ টুকু তুমি আহার করিলে উহা কেমন সুস্বাদু; কিন্তু আঁটিতে কোন স্বাদ নাই কেন? স্বাদ থাকিলে কি রক্ষা ছিল? নিশ্চয় সে শস্য ও বীজ সমুদয় একত্রে আহার করিয়া ফেলিতে! আবার দেখ, ঐ আঁটিটী এত কঠিন কেন? যদি উহা গলাধঃ-করণ করিতে চেষ্টা কর, পারিবে না! বাল্মীকিবর্ণিত ত্রেতা-যুগের ব্যাপার সংঘটিত হইবে। যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা কেবল তোমার আমার জন্য ভাবে না; আমাদের ভাবী বংশধরেরা যাহাতে সুস্বাদু ফল ভোজন করিতে পায়, তাহারও আয়োজন করে।

এই স্থলে আনুষঙ্গিকরূপে আর একটি কথা বলি। কোন

ব্যক্তি তোমাকে একটি পাত্রে করিয়া মিষ্টান্ন আহার করিতে দিল। তুমি মিষ্টান্নগুলি সব খাইয়া ফেলিলে। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখ যে, কেহ রাখিয়া যায় নাই, অথচ পাত্রটী মিষ্টান্নে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে গুলিও তুমি আহার করিলে। কিছুকাল পরে আবার দেখ, পাত্রটী মিষ্টান্নপূর্ণ হইয়াছে। তুমি সে গুলিও নিঃশেষ করিলে। এইরূপে মহাদেবের ঝুলির ন্যায়, যত খাও, ততই আবার মিষ্টান্ন। যে শিল্পকর এমন আশ্চর্য্য পাত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তুমি তাহার প্রশংসা কর না? এ প্রকার পাত্র নির্ম্মাণে কি জ্ঞানকৌশল প্রকাশ পায় না?

তবে ভাব দেখি, এ জগতে সর্ব্বদাই কি হইতেছে! ধরণী-রূপ সুবিস্তৃত পাত্রে আম, যাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল-সকল সাজাইয়া জীবদিগের সম্মুখে কে ধরিয়া দিল? সকল জীব পরমানন্দে আহার করিল; সব ফল ফুরাইয়া গেল, পাত্রে আর কিছু রহিল না। কিন্তু কিছুকাল পরে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি অশেষ প্রকার সুস্বাদু ফলে কে আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল? আবার জীবগণ আহার করিল, আবার পাত্র পূর্ণ। এই যে ধরিত্রীপাত্র অচিন্তনীয় কাল হইতে অসংখ্য জীব শ্রেণীকে অগণ্য বংশ-পরম্পরায় আহার দান করিতেছে, ইহাতে কি এক অদ্ভুত জ্ঞান-কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হওনা! মহাদেবের ঝুলি গল্প নয়; মহাদেবের ঝুলি চিরদিন আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান।

যে আশ্চর্য্য কৌশলে সমুদয় প্রাণী আহার লাভ করিতেছে, চিন্তা করিলে যথার্থই হৃদয় বিগলিত হয়। গ্রীষ্মকালে এক

দিবস বলিলাম, "আজ বড় গরম;" একজন ভদ্র-মহিলা বলিলেন, "ইহা রান্নাঘরের গরম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন, "জগতের মাতা তাঁহার সন্তানদিগেব জন্য রন্ধন করিতেছেন। এই গরমে আম, যাম, কাঁঠাল প্রভৃতি পাকিয়া উঠিবে।"

ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বিষয়ে আর একটি কথা। যখন মাতৃগর্ভ্ভে ছিলাম, তখন তো চলিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সেখানে এই চরণ-যুগল উৎপন্ন হইল কেন? সেখানে তো কিছু গ্রহণ কবিবাব প্রয়োজন ছিল না, তবে এই হস্তদ্বয় হইল কেন? সেখানে তো দর্শনেব প্রয়োজন ছিল না, তবে সেই নিবিড় অন্ধকারে নয়নদ্বয় সৃষ্ট হইল কেন? সেখানে তো শ্রবণের আবশ্যক ছিল না, তবে কর্ণের উৎপত্তি হইল কেন? সেখানে তো আস্বাদনেব প্রয়োজন ছিল না, তবে সেখানে রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল কেন? আঘ্রাণেরও প্রয়োজন ছিল না, তবে ঘ্রাণেন্দ্রিযের সৃষ্টি হইল কেন?

তোমার পুত্র দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিতে যাইবে। তাহার ইচ্ছা যে শান্তিপুবে ফিন্‌ফিনে ধুতি ও ঢাকাই চাদর পরিধান করিয়া যায়। তুমি জান যে, সেরূপ পরিচ্ছদে গমন করিলে সে শীতে মারা যাইবে। তুমি তাহাকে উত্তম গরম পোষাক দিয়া দার্জ্জিলিং প্রেরণ কবিলে। এস্থলে কয়েকটী বিষয়ে তোমার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম, তুমি জান যে দার্জ্জিলিং কি প্রকার স্থান। দ্বিতীয়তঃ, তুমি জান যে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া সেখানে গমন করিলে ক্লেশ পাইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, তুমি জান যে, বনাত প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া গমন করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এই কয়েক বিষয়ে জ্ঞান ভিন্ন তুমি কখনই তোমার পুত্রকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করিয়া দার্জ্জিলিং পাঠাইতে পাব না।

যে শক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভ হইতে সংসারে প্রেরণ করে, তাহা কি অন্ধশক্তি? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া পূর্ব্ব হইতে জানিল যে, শিশু কয়েকমাস পরে এমন একস্থানে যাইবে, যেখানে তাহার দর্শন, শ্রবন্ন, আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া জানিল যে, সংসারে গিয়া সেই জরায়ুশায়ী শিশুব কি কি প্রয়োজন উপস্থিত হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া জানিল যে, কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, কি প্রকাব যন্ত্র সকলেব সাহায্য প্রাপ্ত হইলে সে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে আপনাব জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে? অন্ধশক্তির ভাবীজ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? মাতৃগর্ভস্থ শক্তির অবশ্য এ জ্ঞান অছে যে, শিশু কয়েকমাস পরে স্থানান্তরে গমন করিবে। সেই স্থানের অবস্থা কি প্রকার, সেখানে গমন করিলে, গর্ভস্থ জীবের কি কি প্রয়োজন ও অভাব হইবে, কি কি উপকরণ ও যন্ত্র থাকিলে সেই সকল অভাব মোচন হইতে পারে, এই সমুদয় বিষয়ে অবশ্য গর্ভস্থ শক্তির জ্ঞান আছে। কে বলে অন্ধশক্তি? জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী আদ্যাশক্তি, মাতৃগর্ভে জীবের প্রকৃত জননীরূপে বর্ত্তমান। যিনি বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী, তিনিই প্রত্যেক জীবের "প্রসবকালে ধাত্রী"।

এই বিষয়টী যতই চিন্তা করা যায়, ততই অতি অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। ভাবীজ্ঞানের পরিচয় পদে পদে। মাতৃ-গর্ভেই চক্ষুর উপর পাতাটীর সৃষ্টি হইল কেন? পাতার উপরে পক্ষ্মগুলি বিন্যস্ত হইল কেন? গর্ভস্থ শিশুর চরণাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় শরীর ভাবীজ্ঞানের অখণ্ডনীয় দৃষ্টান্ত। আবার দেখ, শিশু সংসারে আসিয়া তো কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে পারিবে না; পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য উপযুক্ত আহার প্রস্তুত হইল। মাতৃদেহের শোণিত, দুগ্ধরূপে পরিণত হইল। ইহা কি অন্ধশক্তির কার্য্য? যে শক্তি বলিল, "সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ সকল! আকাশমণ্ডলে ভ্রাম্যমান হও;" অমনি সকলে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ধাবমান হইল! যে শক্তি বলিল, "সৌরজগৎ সকল! স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হও," অননি কোটী কোটী সৌরজগৎ আজ্ঞাবহদাসের ন্যায় অনন্ত আকাশে দৌড়িতে লাগিল! যে শক্তি জড়পরমাণু সকলকে বলিল "অগণ্য অসংখ্য বৃক্ষ লতারূপে পরিণত হও" তাহারা বৃক্ষ লতারূপ ধারণ করিল! যে শক্তি প্রতি-নিয়ত গর্ভস্থ শোণিতকে বলিতেছ, "জীবরূপে পরিণত হও" আজ্ঞামাত্র কোটী কোটী জীব উৎপন্ন হইতেছে! সেই শক্তি

---

* রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানব দেহ রক্ষা ও পোষণের জন্য যে যে পদার্থ আবশ্যক, কেবলমাত্র দুগ্ধে সেই সকল গুলিই আছে। দুগ্ধের ন্যায় এ প্রকার আর দ্বিতীয় সামগ্রী নাই। কেবল দুগ্ধপান করিয়া মনুষ্য যাবজ্জীবন সুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিতে পারে। এরূপ কেন হইল? সুতরাং শিশু তো দুগ্ধভিন্ন আর কিছু খাইতে পারেনা।

মাতৃস্তন-নিহিত রক্তকে বলিল "আমার সন্তান সংসারে আসিয়া আহার করিবে, শোণিত! তুমি দুগ্ধ হও" অমনি শোণিত দুগ্ধ হইল! "শোণিত! তুমি বাল্মীকি হও, কালিদাস হও, ভবভূতি হও, আর্য্যভট্ট হও, বেকন হও, নিউটন হও, সেক্সপিয়র হও, মিল্টন হও," শোণিত বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট, বেকন, নিউটন হইল। যে শক্তি রক্তবিন্দু হইতে কালিদাস, সেক্সপিয়র, বেকন, নিউটন উৎপন্ন করিতে পারে, সেই শক্তি রক্তস্থানে দুগ্ধ সঞ্চার করিবে, বিচিত্র কি?. একমুষ্টি ধূলি হস্তে লইয়া একজন বাজিওয়ালা বলিল, "একটা পক্ষী হও," অমনি ধূলিমুষ্টি পক্ষী হইল। ইহা দেখিলে কি আশ্চর্য্য হও না? তবে যে শক্তির আজ্ঞামাত্রে রক্তবিন্দু হইতে কালিদাস ও সেক্সপিয়র, আর্য্যভট্ট ও বেকন উৎপন্ন হয়, সে কেমন আশ্চর্য্যময়ী শক্তি!

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টির কার্য্য চলিতে থাকে। ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি বাহির হইতেছে কেন? ও এখন দুগ্ধপান করে, উহার দন্তের প্রয়োজন কি? সে কথা বলিলে চলিবে কেন? আর কিছু দিন পরেই কঠিন দ্রব্য আহার করিবে। এখন তাহার আয়োজন হইতেছে। সম্মুখে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, উহাতে খাদ্যদ্রব্য কর্ত্তিত হইবে। দুই পার্শ্বে যাঁতা বসান হইতেছে; উহাতে খাদ্য পেষিত হইবে। পেষিত হইবার পর, যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ খাদ্যের অসার অংশ নিষ্কাসিত করিয়া উহার সার অংশদ্বারা দেহের অভাবপূরণ ও পুষ্টিসাধন হইবে, তাহা জন্মের

পূর্ব্ব হইতেই শিশুর শরীরাভ্যন্তরে নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহাই কি অন্ধশক্তির কার্য্য ?

সৃষ্টি-কৌশল ও উপমিতি।

যাঁহারা সৃষ্টি-কৌশল হইতে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান, সন্দেহবাদীদিগের একটী আপত্তি তাঁহাদের খণ্ডন করা আবশ্যক। স্বর্গ মর্ত্ত্য ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টি-কৌশলের রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কেন সংগ্রহ কর না, প্রখরবুদ্ধি সন্দেহবাদী তাহাতে ভুলিবার লোক নহেন।

সন্দেহবাদী বলিবেন যে প্রকৃতির মধ্যে "কৌশল দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ যে, উহা অবশ্য কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সৃষ্টি। তুমি সর্ব্বদা দেখিতে পাও যে, মানুষ আপনার জ্ঞান-বলে অনেক প্রকার কল কৌশল উৎপন্ন করে; সেই জন্য তুমি মনে কর যে, প্রকৃতির ভিতরে যে সকল কল কৌশল রহিয়াছে, তাহাও অবশ্য কোন জ্ঞানবান পুরুষ সৃষ্টি করিয়া-ছেন। প্রকৃতি-সম্বন্ধে তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ, উহা কেবল মানুষের তুলনায়। তুমি দেখিতে পাও যে, মানুষ আপনার জ্ঞানবলে অনেক প্রকার কৌশল উৎপন্ন করে। প্রকৃতির মধ্যেও কতক পরিমাণে তদনুরূপ কৌশল দেখিতে পাও, কিন্তু তাহার কারণ দেখিতে পাও না। তুমি দেখিয়াছ যে, মানুষ যে সকল কৌশল সৃষ্টি করে, তাহার কারণ মানুষের জ্ঞান; সুতরাং তুমি মনে কর যে, প্রকৃতির অন্তর্গত কৌশল সকলও কোন প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

সন্দেহবাদী বা নাস্তিকদিগের মতে এপ্রকার যুক্তি কেবল উপমিতি মাত্র। ইহাতে নিশ্চিতরূপে কিছুই প্রমাণ হয় না। মানুষের জ্ঞান হইতে কল কৌশল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। হঠাৎ কোন নির্জ্জন স্থানে একটা ঘড়ি দেখিয়া মনে করি যে, উহা অবশ্য কোন মানুষের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন; কেননা মনুষ্যবুদ্ধি হইতে যে ঘড়ি উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা তো কখন দেখি নাই। সুতরাং মানুষের দৃষ্টান্তে প্রাকৃতিক কৌশলের জ্ঞানময় কারণ সিদ্ধান্ত করা কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি হইতে যে কল কৌশল প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ইহা কি বাস্তবিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ? আমার নিজের যে টুকু জ্ঞান আছে, তাহা অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করি। কিন্তু অপর মনুষ্যের জ্ঞান কি কখন দেখিয়াছি? দেখার অর্থ যদি চক্ষে দেখা হয়, তাহা হইলে কাহারও জ্ঞান, মন বা বুদ্ধি কখনও দেখি নাই। অপর মনুষ্যের কি দেখিতে পাই? তাহাদের শরীর ও শারীরিক কার্য্য। মন কিম্বা মানসিক কার্য্য, কখন কাহারও দেখি নাই।

তবে অন্য মানুষের যে মন আছে, কে বলিল? তাহাদের হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি যে আছে, স্বীকার করি; কেননা তাহা দেখিতে পাই। অন্য লোকের মন তো কখন দেখি নাই; তবে মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব কেন? তাহাদের জ্ঞান; বুদ্ধি, ভাব কিছুই কখন দেখি নাই। যদি "ইন্দ্রিয়

জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ” হয়, তবে অন্য লোকের যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আছে, এ জ্ঞান তো কখন সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে নাই।

মানুষ অর্থ কি? হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কি মানুষ? মানুষ বলিলে যে কেবল অস্থি মাংস বুঝায়, ইহা কখন হইতে পারে না। মানুষ বলিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, ঘৃণা, লজ্জা এই সকল মনে হয়। এক কথায় মন বা আত্মা যাহাই বল। মানুষ শব্দের অর্থ যদি ইহাই হয, তাহা হইলে আমি আপনি ভিন্ন অন্য মানুষকে কখন দেখি নাই। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা স্ত্রী প্রভৃতি কাহাকেও কখন দেখি নাই। প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী, জগদ্বাসী কাহাকেও কখন দেখি নাই। দেখা অর্থ যদি চক্ষের দেখা হয়, তাহা হইলে কোন মানুষ কখন কোন মানুষকে দেখে নাই।

তবে যাহাদিগকে মানুষ বলি, তাহাদিগের যে শরীব ভিন্ন আবার একটী একটী মন আছে, ইহা বিশ্বাস কবি কেন? কার্য্য দেখিয়া। মৃত শবীবকে মানুষ বলি না, কেননা তাহাতে মনের কার্য্য দেখিতে পাই না। সকল স্থলেই কার্য্য দেখিয়া মন বা জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। সে কার্য্য কি? কৌশল। বাহ্য-পদার্থের সংযোগ বিয়োগ, ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি যে প্রকারেই হউক, কৌশল প্রকাশ পায় বলিয়াই মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যেখানে যে পরিমাণে কৌশল, সেখানে সেই পরিমাণ বুদ্ধির সত্তা সিদ্ধান্ত

করি। বুদ্ধির বাহ্যচিহ্নদ্বারা বুদ্ধির সত্তা প্রতিপন্ন হয়। মৃত শরীরে কোন চিহ্ন দেখি না, সুতরাং সেখানে বুদ্ধির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কোন মনুষ্যের বুদ্ধির কার্য্য অল্প দেখিলে, তাহাকে অল্পবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করি। সচরাচর লোকের যে প্রকার বুদ্ধির কার্য্য হইয়া থাকে, কাহারও সেই প্রকার কার্য্য দেখিলে, তাহার বুদ্ধি মধ্যম শ্রেণীর বলিয়া স্থির করি। আবাব যাঁহার কার্য্য অসাধারণ, যিনি আপনার বাক্যে ও কার্য্যে জ্ঞানের অসামান্য চিহ্ন সকল প্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রতিভাশালী লোক বলিয়া গণ্য করি।

এখন একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যদি কৌশলের পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বরং বলিব যে মানুষের কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই পরমাশ্চর্য্য কৌশল-জাল-জড়িত ব্রহ্মাণ্ডে যে কোন জ্ঞান কার্য্য করিতেছে না, ইহা যে কেবল অন্ধ-শক্তির ক্রীড়া মাত্র, এমন কথা কথনই বলিতে পারি না।

এমন আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্যক্তি কোনপ্রকার জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও আশ্চর্য্য! যদি কোন বুদ্ধি-গর্ব্বিত নাস্তিক আমার নিকট বলেন যে "এই জগৎ যে কোন প্রকাব জ্ঞানময় শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বলিব, বলুন দেখি আপনার যে বুদ্ধি আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? যদি এই দুরবগাহ্য কৌশল পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কোন প্রকার জ্ঞানের চিহ্ন না থাকে, তাহা

হইলে আপনার যে জ্ঞান আছে, আপনি যে অস্থি চর্ম্ম নির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা নহেন, তাহারই বা প্রমাণ কি ?" কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, অন্য মনুষ্যের যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আছে, ইহা কেবল শারীরিক সাদৃশ্যে বুঝিতে পারি। আমার যেমন শরীর ও শারীরিক কার্য্য আছে, অন্যেরও সেইরূপ শরীর ও শারীরিক কার্য্য দেখিতেছি; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আমার ন্যায় তাহার মন ও মানসিক কার্য্য আছে। অর্দ্ধেক মিলিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, অপরার্দ্ধও অবশ্য মিলিবে।

ইহাই কি সুযুক্তি হইল ? সংসারে আমরা সর্ব্বদা কি দেখিতে পাই ? বার আনা মিলে, সিকি মিলে না; আট আনা মিলে, আট আনা মিলে না; সিকি মিলে, বার আনা মিলে না। যখন এইরূপ আংশিক ঐক্য ও অনৈক্য, কেবল দুই একটী স্থলে নয়, কোটী কোটী স্থলে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, যখন শরীর ও শারীরিক কার্য্য মিলিতেছে, তখন অপরার্দ্ধ মন ও মানসিক কার্য্যও অবশ্য মিলিবে। ইহাই কি সুযুক্তি-সঙ্গত বাক্য হইল ?

এস্থলে আর একটী যুক্তির বিষয় আলোচনা করিব। আমার জ্ঞান আছে, ইহা সহজ জ্ঞানে জানিতেছি; আমার জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন অন্য মানুষের সেইরূপ কার্য্য আমার কার্য্যের অনুরূপ, তখন সেই কার্য্যের কারণও অবশ্য আমার কার্য্যের কারণের তুল্য। অর্থাৎ আমার ন্যায় তাহারও মন বা জ্ঞান আছে।

এই যুক্তিতে দুটী গুরুতর ভ্রম রহিয়াছে। প্রথম, কার্য্য এক প্রকার হইলে যে, সকলস্থলে কারণও এক প্রকার হয়, এমন নহে। কার্য্য এক, কিন্তু কারণ ভিন্ন, জগতে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। পাঁচজনের জ্বর হইল; কাহারও অতিভোজনে, কাহারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে, কাহ রও ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করিয়া, এবং কাহারও বা বৃষ্টিতে ভিজিয়া। পাঁচশত লোকের মৃত্যু হইল। পাঁচশত লোকের পাঁচশত প্রকার কারণে মৃত্যু হইতে পারে। আবার বিপরীত কারণ হইতে সমান কার্য্য উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত উত্তাপ ও অত্যন্ত হিমের এক প্রকার কার্য্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যের সহিত, অপরের কার্য্যের সাদৃশ্য দেখিয়া কখনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, এই শেষোক্ত প্রকার কার্য্যের কারণ বুদ্ধি।

এ যুক্তিতে আর একটী ভুল এই যে, একটী মাত্র স্থল হইতে বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইতেছে। সে একটী মাত্র স্থল আমি নিজে। আমার পক্ষে যাহা সত্য, সমগ্র জগতের পক্ষে তাহা সত্য, ইহা তর্কশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা। একটী বোম্বাই আম্র আহার করিয়া যদি মনে কর যে, আম্রফল মাত্রই সেইরূপ সুমিষ্ট, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার ভুল হইল। কলিকাতার কমলালেবুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তুমি মনে করিতে পার যে, কমলালেবু মাত্রই অম্লরসযুক্ত; কিন্তু শ্রীহট্টের কমলা সেবন করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আমার কার্য্যের কারণ আমার মন, সুতরাং যেখানে

সেই প্রকার কার্য্য, সেখানেই কারণস্বরূপ মন বর্ত্তমান, এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই তর্কশাস্ত্র বিরুদ্ধ। কেননা ইহাতে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বিশ্বজনীন মীমাংসায় উপনীত হইতেছি।

বাস্তবিক কথা এই যে, আমার যেমন মন আছে, অপরেরও সেইরূপ মন আছে, তর্ক করিয়া ইহা মীমাংসা করা অসম্ভব। তর্কশাস্ত্র এখানে পরাভব স্বীকার করিতেছে।

প্রাকৃতিক কৌশল সকল যে, কোন জ্ঞানময় কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তর্কশাস্ত্রের প্রাণালী অনুসারে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করা যায় কি না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, যায় না কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলেন যে, যদিও নিশ্চয় হয় না; কিন্তু বিলক্ষণ সম্ভবপর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

তর্কশাস্ত্র প্রাকৃতিক কৌশল নিচয়ের জ্ঞানময় কারণ নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে অক্ষম। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, প্রতিবাসীগণের যে মন আছে, তাঁহারা যে এক একটী অস্থি মাংসময় কল নহেন, তর্কশাস্ত্র তাহা কি সাব্যস্ত করিয়া দিতে পারে? কখনই না। কি জড়জগৎ, কি মনুষ্য, উভয় সম্বন্ধেই তর্কশাস্ত্র কতকদূর গিয়া আর যাইতে পারে না। এখানেও সম্ভবপর; ওখানেও সম্ভবপর। তর্ক এই উভয়ের মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চয়তাতে উপনীত করিতে পারে না।

কিন্তু তর্কে প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া কি যথার্থই মনে করিতে হইবে যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্যের, আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলের যে মন আছে, ইহা সম্ভবপর মাত্র? ইহাতো হাস্যের কথা। আমরা এমনি প্রকৃতি লইয়া জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছি যে, কি মনুষ্যের মধ্যে, কি জড়ের মধ্যে, যেখানে দেখিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বিত হই- য়াছে, সেখানেই জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব। এখানে তর্কশাস্ত্রের কোন হাত নাই। স্বভাব এই বিশ্বাস আমাদের মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু স্বভাবের ঠিক্ প্রণালী কি, তাহা হয়তো এখনও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

এস্থলে নাস্তিক বলিবেন যে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা স্বীকার কবিয়া লইলে চলিবে কেন? প্রকৃতির ভিতরে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধিজন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সত্য; কিন্তু কে বলিল যে, প্রাকৃতিক কার্য্যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে? কে বলিল, দেখিবার জন্য চক্ষু হইয়াছে, শুনিবার জন্য কর্ণ হইয়াছে, আস্বাদনের জন্য রসনা হইয়াছে? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া বৃক্ষে সুস্বাদু ফল ফলি তেছে? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া শরীরে ক্ষুধার সঞ্চার হইতেছে? যদি বল, কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে, এ কথা বলিবার আবশ্যক কি? সকলই আপনা আপনি হইয়াছে; উপায় উদ্দেশ্য কিছুই নাই। তুমি তোমার মনের

ভাব অনুসারে একটাকে উদ্দেশ্য ও আর একটাকে উপায় ভাবিতেছে। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি; একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু দেখিবার জন্য চক্ষু হইয়াছে, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি? আম্র ফল আহার করি, সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু আহার করিবার জন্য আম্রের উৎপত্তি, ইহা বলিবার আবশ্যক কি?

স্থলপথে ভ্রমণের জন্য শকট হইয়াছে; নদী দিয়া যাইবার জন্য নৌকা হইয়াছে; সমুদ্র পার হইবার জন্য জাহাজ হইয়াছে, শীঘ্র গমনের জন্য রেলের গাড়ী হইয়াছে, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি? সময় জানিবার জন্য ঘড়ি হইয়াছে, সংবাদ পাইবার জন্য তাড়িতবার্ত্তাবহ হইয়াছে, বাস করিবার জন্য গৃহ হইয়াছে, লিখিবার জন্য কাগজ হইয়াছে, এমন কথা বল কেন? শকট ও নৌকাদিতে আরোহণ করি, ঘড়িতে সময় জানি, টেলিগ্রাফের তারে সংবাদ পাই, গৃহে বাস করি, কাগজে লিখি। এসকল কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আরোহণ করিবার জন্য শকট ও নৌকার উৎপত্তি, সময় জানিবার জন্য ঘড়ির সৃষ্টি, সংবাদ জানিবার জন্য টেলিগ্রাফের তার, বাস করিবার জন্য গৃহ, লিখিবার জন্য কাগজ, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

মানুষের কার্য্যে যেমন স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, প্রকৃতির কার্য্যেও সেইরূপ স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। ঘটিকাযন্ত্রে কি অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? সময় জানা। মানব দেহে যে পাকযন্ত্র রহিয়াছে, উহাতে কি অভিপ্রায় প্রকাশ

পায় ? খাদ্য পরিপাক করা। একটী মানুষের যন্ত্র, আর একটী প্রকৃতির যন্ত্র। এই উভয়স্থলেই কি সমান স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে না ?

কিন্তু অভিপ্রায় কি কখন চক্ষে দেখা যায় ? অভিপ্রায় জড়ের ধর্ম্ম নহে ; মন বা জ্ঞানের ধর্ম্ম। অভিপ্রায় ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ। জড় জগতে কি মনুষ্যের মধ্যে উভয়স্থলেই কার্য্য দেখিয়া অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করি ; চক্ষু কর্ণাদিদ্বারা কোন স্থলেই অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এখানেও কার্য্য দেখিয়া কারণ, ওখানেও কার্য্য দেখিয়া কারণ। এখানেও কার্য্য দেখি, ওখানেও কার্য্য দেখি ; কিন্তু কারণ উভয় স্থলেই অদৃশ্য।

এখন দেখুন, আমরা কোথায় উপনীত হইলাম। যে প্রণালীতে জানি যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্য আছে, সেই প্রণালীতে জানি, এই জগতের একজন জ্ঞানময় স্রষ্টা আছেন। যে প্রণালীতে জানি যে, আমর পার্থিব পিতা আছেন, সেই প্রণালীতে জানি যে, আমার স্বর্গীয় পিতা আছেন। যে প্রণালীতে জানি যে, আমার গর্ভধারিণী মাতা আছেন, সেই প্রণালীতে জানি যে, জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী আছেন। যে প্রণালীতে সংসারের বন্ধুকে জানি, সেই প্রণালীতেই সংসারাতীত পরম বন্ধুকে জানিতে পারি।

তবে কি কোন বিষয়ে ভিন্নতা নাই? আছে। মনুষ্যের শরীর আছে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার শরীর নাই। মানুষের শরীর আছে বলিয়াই কি আমরা

তাহার কার্য্যের অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করি? কখনই না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহাতে দুটী ভ্রম হয়। প্রথমতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, কার্য্য এক প্রকার হইলে কারণও এক প্রকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটীমাত্র স্থল হইতে সার্ব্বভৌমিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যে শক্তি প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা অশরীরী বলিয়া কোন কোন অনীশ্বরবাদী তাহাকে জ্ঞানময়ী বলিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেখানে শরীর দেখিয়াছি, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অনুভব করিয়াছি; মস্তিষ্কের সহিত জ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ। সুতরাং যখন প্রকৃতি-গত শক্তির শরীর নাই, তখন তাহাকে জ্ঞানময়ী শক্তি বলা কখনও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

জ্ঞানী মার্টিনো এই কথার উত্তরে বলিয়াছেন ;—" I say first of all, that this demand for a divine brain and nerves and arteries comes strangely from those who reproach the Theist with "anthropomorphism." In order to believe in God, they must be assured that the plates in "Quain's Anatomy" truly represent him. If it be a disgrace to religion, to take the human as measure of the Divine, what place in the scale of honour can we assign to this stipulation? Next I ask my questioner, whether he suspends belief in his friends' mental powers, till he has made

sure of the contents of their crania? And whether in the case of ages beyond reach, there are other adequate vestiges of intellectual and moral life, in which he places a ready trust? *Immediate* knowledge of mind other than his own he can never have; its existence in other cases is gathered from the signs of its activity; whether in personal lineaments or products stamped with thought: and to stop this process of inference with the discovery of *human* beings, is altogether arbitrary, till it is shown that the grounds for extending it are inadequate. Further, I would submit that, in dealing with the problem of the Universal Mind, this demand for organic centralization is strangely inappropriate. It is when mental power has to be localized, bounded, lent out to individual natures and assigned to a scene of definite relations, that a focus must be found for it and a molecular structure with determinate periphery be built for its lodgment."

(*Religion as affected by modern materialism. P. 66-67*)

মার্টিনোর কথার সারমর্ম এই যে, মানুষ আপনার মনকে আপনি সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে; কিন্তু অন্যলোকের যে

তাহার কার্য্যের অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করি? কখনই না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহাতে দুটী ভ্রম হয়। প্রথমতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, কার্য্য এক প্রকার হইলে কারণও এক প্রকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটীমাত্র স্থল হইতে সার্ব্বভৌমিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যে শক্তি প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা অশরীরী বলিয়া কোন কোন অনীশ্বরবাদী তাহাকে জ্ঞানময়ী বলিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেখানে শরীর দেখিয়াছি, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অনুভব করিয়াছি; মস্তিষ্কের সহিত জ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ। সুতরাং যখন প্রকৃতি গত শক্তির শরীর নাই, তখন তাহাকে জ্ঞানময়ী শক্তি বলা কখনও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

জ্ঞানী মার্টিনো এই কথার উত্তরে বলিয়াছেন;—"I say first of all, that this demand for a divine brain and nerves and arteries comes strangely from those who reproach the Theist with "anthropomorphism." In order to believe in God, they must be assured that the plates in "Quain's Anatomy" truly represent him. If it be a disgrace to religion, to take the human as measure of the Divine, what place in the scale of honour can we assign to this stipulation? Next I ask my questioner, whether he suspends belief in his friends' mental powers, till he has made

sure of the contents of their crania? And whether in the case of ages beyond reach, there are other adequate vestiges of intellectual and moral life, in which he places a ready trust? *Immediate* knowledge ef mind other than his own he can never have; its existence in other cases is gathered from the signs of its activity; whether in personal lineaments or products stamped with thought: and to stop this process of inference with the discovery of *human* beings, is altogether arbitrary, till it is shown that the grounds for extending it are inadequate. Further, I would submit that, in dealing with the problem of the Universal Mind, this demand for organic centralization is strangely inappropriate. It is when mental power has to be localized, bounded, lent out to individual natures and assigned to a scene of definite relations, that a focus must be found for it and a molecular structure with determinate periphery be built for its lodgment."

(*Religion as affected by modern materialism. P 36-67*)

মার্টিনোর কথার সারমর্ম্ম এই যে, মানুষ আপনার মনকে আপনি সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। কিন্তু অন্যলোকের যে

মন আছে, ইহা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না; কার্য্য দেখিয়া জানা যায়। যাহাতে মানসিক ভাব প্রকাশ পায়, এমন কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারি যে, আমার ন্যায় অপর মনুষ্যেরও মন আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি জানিতে পার যে, তোমার বন্ধুর মস্তকের ভিতর মস্তিষ্ক আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে তুমি তাহার মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না, এমন নহে। মার্টিনোর দ্বিতীয় কথা এই যে, যে মন বা জ্ঞান দেশ কালে বদ্ধ তাহার পক্ষেই শরীর সম্ভব। কিন্তু যে জ্ঞান বিশ্বব্যাপী তাহার পক্ষে শরীর সম্ভব নহে।

প্রাকৃতিক শক্তি ও মনুষ্যের মধ্যে আর একটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। মানুষ কথা বলিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি কথা কহে না। কিন্তু মানুষের ভাষা ও কার্য্য বাস্তবিক একই। ভাষা ও কার্য্য উভয়ই মানুষের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। একজন একটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিল; এবং কোন বিষয়ে কথা বলিল। ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টিতে কি হইল? কতকগুলি জড়পদার্থের বিশেষ বিন্যাসে একটী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল। কথা বলাতে কি হইল? কতকগুলি শব্দের বিশেষ বিন্যাসে একটী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল। ভাষাও একপ্রকার কল। অভিপ্রায় অন্তরের বস্তু। যন্ত্র বা ভাষা বাহ্যপদার্থ হইলেও, সঙ্কেতস্বরূপ হইয়া অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রকৃতি কি মনুষ্য উভয় স্থলেই কার্য্য দেখিয়া জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এখন কেহ বলিতে পারেন যে, যখন

উভয় স্থলে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই ;—মানুষের শরীর আছে, প্রাকৃতিক শক্তির শরীর দেখিতে পাই না, মানুষের ভাষা আছে, প্রকৃতিগত শক্তি কথা কহে না,—তখন এক প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ?

যুক্তিবিরুদ্ধ কেন হইবে ? ভাষা জ্ঞান প্রকাশক কার্য্যমাত্র। শারীরিক সাদৃশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেবল সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা পরস্পবকে জ্ঞানসম্পন্ন জীব বলিয়া বিশ্বাস করি না। জ্ঞানের চিহ্ন দেখিয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি।

তবে কি শারীরিক সাদৃশ্যের কোন কার্য্যকারিতা নাই ? শারীরিক সাদৃশ্য পরস্পরেব ভাবগ্রহণে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের সে প্রকার কোন সাদৃশ্য নাই ; সুতরাং সেরূপ সাহায্যও সেখানে নাই। সেইজন্যই স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা মানুষেব কার্য্যে যে প্রকার জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পায়, প্রকৃতির ভিতরে সে প্রকার দেখিতে পায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির রাজ্যে যে অতলস্পর্শ অসীম জ্ঞানসাগর দেখিতে পান, তাহার তুলনায় মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য গোষ্পদ বলিয়াও অনুভূত হয় না।

মানুষ যে মানুষের জ্ঞান অধিকতর স্পষ্টরূপে অনুভব করে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। মানুষ পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ। মানুষের জ্ঞান, ভাব সকলই অতি ক্ষুদ্র পদার্থ ; সুতরাং মানুষ, মানুষের জ্ঞানকে সহজে বুঝিবে, মানুষের ভাবকে সহজে ধারণা করিবে, ইহাই তো সম্ভব। যে জ্ঞানময়ী অসীমশক্তি

এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছে, তাহাকে ধারণ করা যে কঠিন হইবে, তাহা তো সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু অনুরাগ থাকিলে, চিন্তা থাকিলে, প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্ট, উজ্জ্বল, সর্ব্বত্রব্যাপী জ্ঞানালোক দেখিয়া জীব কৃতার্থ হইয়া যায়।

একদিকে যেমন সাদৃশ্য অধিক, অপরদিকে জ্ঞানকৌশল অনন্তগুণে অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে দুরবগাহ্ জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহার সহিত তুলনা করিলে মনুষ্যের জ্ঞান কিছুই নহে। বরং বলিব মানুষের কোন বুদ্ধি, কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই বিশ্বকার্য্যে যে জ্ঞানময়ীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না। সামান্য একটী তৃণকণা, একটী জলবিন্দুতে যে জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে, মনুষ্যবিরচিত রাশি রাশি সাহিত্যদর্শন তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়।

"কে জানে মহিমা বিভু তোমার। বলিব-কিবা, বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।"

ঘটনাক্রমে কৌশল।

অনীশ্বরবাদী তার্কিক বলিবেন যে, জ্ঞান ভিন্ন কি কৌশল উৎপন্ন হইতে পারে না? ঘটনাক্রমে কি কৌশল হইতে পারে না?

ঘটনাক্রমে কৌশল উৎপত্তি কি প্রকার? গত রাত্রে আমি শয্যায় গমন করিবার সময় একটা দোয়াত, কলম ও

কাগজ বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম ; প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, ঐ তিনের সহযোগে একটী প্রবন্ধ রচিত হই-য়াছে। এ কথায় কি কেহ বিশ্বাস করিবেন ? যদি জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কেবল মাত্রজড় পরমাণুর সংযোগে এমন অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞানের কর্তৃত্ব ভিন্ন কেবল দোয়াত, কলম, কাগজের সংযোগে একটী প্রবন্ধ রচিত হইবে আশ্চর্য্য কি ? থিওডোর পার্কার বলেন, এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানব্যাপী বায়ুতে যে জ্ঞান কৌশল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে জগতের সমুদয় সাহিত্যদর্শন কিছুই নহে।

ছাপাখানার টাইপ সকল ঘটনাক্রমে বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত হইল, ঘটনাক্রমে তাহাতে কালী সযুংক্ত হইল, ঘটনাক্রমে তা-হার উপর কাগজ আসিয়া পড়িল ; ঘটনাক্রমে এক আশ্চর্য্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। ইহা কি অসম্ভব ? ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দুরবগাহ্য জ্ঞানপূর্ণ এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ডবেদ জড় পরমাণু হইতে সংরচিত হইয়াছে, এ কথা কি অনন্তগুণে অধিক অসম্ভব নয় ?

রন্ধনশালায় চিনি, ছানা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিলাম, কিছু কাল পরে গিয়া দেখি, ঘটনাক্রমে সামগ্রী গুলির উপযুক্ত সংযোগ হইয়া অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা কি অসম্ভব ? ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে যে ব্রহ্মাণ্ডের এককণা মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে নিউটন, বেকন, আরিষ্ট-টল, আর্য্যভট্টের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়, তাহা অন্ধ

জড়শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি হাস্যের কথা নহে ?

কখন কোন কৌশল কি ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে না ? এমন সামান্য প্রকার কৌশল ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে যাহাকে কৌশল বলিলে হয়, নাও বলিলে হয়। মনে কর, তুমি একস্থানে দেখিলে যে, একঘটি জল ও এক জোড়া খড়ম রহিয়াছে। এখানে তুমি মনে করিতে পার যে, কোন ব্যক্তি পদধৌত করিয়া খড়ম পরিবে বলিয়া ঐরূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, বিভিন্ন অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তি জলপাত্র এবং অপর এক ব্যক্তি খড়ম রাখিয়া গিয়াছে। জলপাত্র ও খড়মের একত্র সমাবেশে ব্যক্তি-বিশেষেব অভিপ্রায় থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। কিন্তু এই ঘটি ও খড়ম সম্বন্ধে যেমন মনে করিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে হইয়াছে, অন্যান্য সকল স্থলে কি সেই রূপ মনে করিতে পার ? চক্র, কাঁটা, স্পৃং প্রভৃতি ঘটনাক্রমে এমনি সংযুক্ত হইয়া গেল যে, একটী সুন্দর ঘটিকাযন্ত্র চলিতে লাগিল, ঠিক্ সময় বলিয়া দিতে লাগিল। কোন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত কেবল জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগে একখানিবাষ্পীয়যন্ত্র প্রস্তুত হইল, স্থলপথে বা জলপথে মনুষ্যের কার্য্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ কিছু জানে না ; কেবল অন্ধ জড়শক্তি হইতে ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত হইল। এ প্রকার ঘটনা কি সম্ভব ? এ প্রকার ঘটনা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন ?

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। একদিন ঘটনাক্রমে ঘটি ও খড়ম একত্র হইতে পাবে দুই দিন বা তিন দিন হইতে পাবে; কিন্তু যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে চিরদিন ঐরূপ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে ঘটিতেছে? অপবিবর্ত্তনীয় রূপে চিরদিন (invariably) যাহা সংঘটিত হয়, এরূপ ঘটনাকে কেহ কখন অনিচ্ছা-সম্ভূত আকস্মিক ঘটনা বলে না; বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

মনে কর, এমন একজন লোক আছে যে, সে যখন তাস খেলিতে বসিয়া তাস কাটাইয়া দেয়, প্রতিবারে প্রত্যেকের হস্তে ঠিক্ এক প্রকাব কাগজ পড়ে। সে ব্যক্তি যখন যেখানে তাস খেলিতে বসিয়া তাস কাটাইযা দেয়, তখনই সেখানে ঠিক্ এক কাগজ সকলের হাতে পড়িবেই পড়িবে। এরূপ দেখিলে কি তুমি বলিবে যে, উহা ঘটনাক্রমে হইতেছে? দুই একবার হইলে বলিতে পাব, ঘটনাক্রমে হইল। কিন্তু যদি দেখ যে, অপবিবর্ত্তনীয় রূপে চিবদিন ঐ প্রকার ঘটিতেছে, তাহা হইলে ঘটনাক্রমে হইতেছে এমন কথা বলিবার পথ থাকে না।

মনে কর একজন পাসা খেলিতে বসিয়া যখনই পাসা ফেলে, তখনই 'কচেবারো' হইয়া যায়; একবার নয়, দুইবার নয়, যখন, যেখানে যায়, যাহাদের সঙ্গে সে ব্যক্তি পাসা খেলিতে বসে, তখনই সেখানে পাসা ফেলিবামাত্র 'কচে-বারো' হইয়া যায়। এরূপ হইলে কি বলিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে হইতেছে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, সেই

লোকটী এমন নিপুণ খেলোয়াড়, তাহার হাতের কস্ত এমন চমৎকার যে, যখনই সে পাসা ফেলে তখনই 'কচেবারো' হইয়া যায়।

এখন দেখ, এই সুবিশাল প্রকৃতিরাজ্যে যে শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার কার্য্য কি প্রকার? সে শক্তি যখনই পাসা ফেলিতেছে, তখনই কি 'কচেবারো' হইতেছে না? জড়রাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য, প্রাণীরাজ্য যেখানে কেন দেখ না, সর্ব্বত্রই 'কচেবারো'।

পঞ্চভূতের মধ্যে দেখ। অচিন্তনীয় কাল হইতে বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্‌সিজিন একত্রিত হইতেছে, আর জলের সৃষ্টি হইতেছে। চিরদিন এ প্রণালী চলিতেছে; সংসারে কখনই জলের অভাব হয় না। প্রতিবারেই 'কচেবারো।' বিশেষ পরিমাণ নাইট্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্‌সিজিন মিশ্রিত হইতেছে, আর বায়ুর উৎপত্তি হইতেছে। কখনই বায়ুর অভাব হয় না। প্রতিবারেই 'কচেবারো'।

তরুলতার মধ্যে দেখ। প্রতিবৎসর বৃক্ষপত্র স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আবার যে বৃক্ষের যেমন পত্র অবিকল সেইরূপ পত্র উদ্ভিন্ন হইতেছে। প্রতি বারেই 'কচেবারো'। দার্জ্জিলিঙের এক প্রকার পত্র, (Fern) 'ফারণ,' কখন দেখিয়াছেন? উহা এমন সুন্দর, এমন সুচিত্রিত যে, দেখিলে প্রাণ মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। ফারণ নানা প্রকার। প্রত্যেক প্রকার ফারণে এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য যে, দেখিলে হৃদয় আপনা আপনি

বলিয়া উঠে, "ধন্য সেই শিল্পকর, যিনি বিরলে বসিয়া এমন মনোরম শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন!" এই সকল সুন্দর ফারণ খসিয়া পড়িতেছে, আবার যে জাতীয় ফারণ যেমন, অবিকল সেইরূপ ফারণ উৎপন্ন হইতেছে। পাতার শিরগুলি, যেখানে যেমন দাগ্‌টী, ঠিক্ সেইরূপ উৎপন্ন হইতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো'। জগতে যত প্রকার ফলবান্ বৃক্ষ আছে, বর্ষে বর্ষে যে বৃক্ষের যেমন ফল, অবিকল সেইরূপ জন্মিতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো'। প্রাণী জগতে দেখ, কোটী কোটী প্রকার প্রাণীর মধ্যে যে জাতীয় প্রাণী যেমন, তাহাদের বংশে সেই প্রকার প্রাণীই উৎপন্ন হইতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো'। পাঁচপাগরু প্রভৃতি অদ্ভুত প্রাণী কখন কখন জন্মগ্রহণ করে, সত্য; কিন্তু তাহাও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ফল। সেখানেও 'কচেবারো'।

প্রকৃতির অন্তর্গত আশ্চর্য্য কৌশল নিচয় ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। জগদ্বিখ্যাত ডার্‌উইনের উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ক একখানি পুস্তক আছে। প্রাণী জগতে যেমন স্ত্রীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি হয়, বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও সেই প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে। অরর্কিড্ নামক উদ্ভিজ্জের মধ্যে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইয়া যে আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিয়া ডারউইন বলিতেছেন যে, এপ্রকার কৌশল কি ঘটনাক্রমে হইতে পারে? ঘটনাক্রমে যে উহা কখনই হইতে পারে না; এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডার্‌উইন্ বলিতেছেন ;—

"If not accidental, and I cannot believe it to be accidental, what a singular case of adaptation."

(*Fertilization of Orchids* ,

সৃষ্টিকৌশল ও বিবর্ত্তনবাদ।

সৃষ্টিকৌশল্যের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সময়ের অনীশ্বরবাদীগণ একটী নূতন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তুমি বিশ্বকার্য্যে যে সকল কৌশল দেখিতেছ, উহা কোন জ্ঞানময় পুরুষের অভিপ্রায়সম্ভূত নহে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদের নিয়মানুসারে ঐ সকল আপনা আপনি হইয়াছে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ কাহাকে বলে, এস্থলে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, এমন নহে। একটী বস্তু বা প্রাণীর ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়া তাহা হইতে আর একটী বস্তু বা প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। একটী হইতে আর একটী, সেটী হইতে আর একটী, এইরূপে ক্রমে ক্রমে জগতের সমুদয় বস্তু ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদীগণ দুই শ্রেণী-ভুক্ত। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, মূল জড় পরমাণু হইতে জগতের সমুদয় জড়, উদ্ভিদ, ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। জড়পরমাণু হইতে যাবতীয় জড়-পদার্থ হইয়াছে। তারপর জড়ের বিকাশে এমন এক প্রকার উদ্ভিজ্জ হইয়াছে, যাহা কতক্ জড়, কতক্ উদ্ভিজ্জের মত।

ক্রমে উহা হইতে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ হইতে এমন এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কতক্ উদ্ভিদ্, কতক্ প্রাণীর মত। এই শেষোক্ত প্রকার পদার্থের ক্রম-বিকাশে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। পবে একপ্রকার প্রাণী হইতে অন্য প্রকার প্রাণী; এইরূপে অতি সামান্য কোনরূপ প্রাণী হইতে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য পর্য্যন্ত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন যে, জড় হইতে জীব হইয়াছে, ইহাব কোন প্রমাণ নাই। জড় হইতে জড়, জীব হইতে জীব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই তাহাদের মত। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিবর্ত্তনবাদ সমর্থন কবিতেন।

এথন কেহ মনে করিবেন না যে, বিবর্ত্তনবাদী হইলেই নাস্তিক হইতে হয়। ডারউইন নিজে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তবে এমন কতক্‌গুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিলে, জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না।

উপরিউক্ত দুই প্রকার বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নাস্তিকতা সমর্থন করেন, তাঁহাদের যুক্তির অসারত্ব প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। উহা কঠিন কর্ম্মও নহে। যাঁহাদের মতে জড় পরমাণ হইতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা বলেন যে, মূল জড়ে এমন শক্তি ও গুণ আছে, যাহার বিকাশে সংসারের সমুদয় বস্তু ও প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের যত কৌশল দেখিতেছ, সে সকল জড়ীয়

শক্তির বিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে। জড়ীয় গুণ স্বীকার করিলেই হয়; একজন জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

সৃষ্টিকৌশল বুঝাইবার জন্য যদি বল যে, মূল জড়পরমাণতে এমন শক্তি আছে যাহা হইতে এই সকল কৌশল হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুই বুঝান হইল না। আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ পক্ষীদেহ কেমন করিয়া হইল? ডিম্ব হইতে। কেবল এই কথা বলিলে কি সদুত্তর হয়? জটিল কৌশলময় তরুরাজি কেমন করিয়া হইল? বীজ হইতে। এ কথাতেই কি সব বুঝা গেল? কিছুই না।

পক্ষীদেহের কৌশল ডিম্ব হইতে আসিয়াছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, ডিম্বের মধ্যে কৌশল অব্যক্তভাবে (potentially) স্থিতি করিতেছিল। বৃক্ষে যে কৌশল আছে তাহা বীজ হইতে আসিয়াছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, বৃক্ষে যে কৌশল প্রকাশিত, বীজশক্তির মধ্যে তাহাই অদৃশ্যভাবে অবস্থিত। সেইরূপ এজগতে যত কৌশল দেখিতেছি, সমুদয় জড়পরমাণ হইতে আসিয়াছে বলিলে ইহাই বলা হয় যে, প্রাকৃতিক কার্য্যে যে সকল কৌশল প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই অব্যক্তভাবে পরমাণুর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। যদি বল, পরমাণুর গুণে কৌশল হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না; কেবল তুমি একপদ পশ্চাতে লইয়া গেলে, এই মাত্র।

জড়ীয় শক্তি ও যে নিয়মানুসারে উক্ত শক্তি কার্য্য করি-

তেছে, এই উভয়ের মধ্যেই কৌশল বর্ত্তমান। সুতরাং ঐ দুটী স্বীকার করিয়া লইলেই যে কৌশল বুঝান হয়, এমন নহে।

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন অসীম আকাশে পরমাণুরাশি বিঘর্ণিত হইতেছিল, তখন যদি তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা দর্শন করিতে, পরমাণুব মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তি নিহিত ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতে, যে সকল নিয়মে সেই পরমাণুরাশি নিয়মিত হইতেছিল তাহাও সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে, তাহা হইলে কি, ডিম্বের মধ্যে পক্ষীর ন্যায়, বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়, সেই আদিম অন্ধকার নিমজ্জিত, আন্দোলিত পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে এই সুবিশাল, সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্তসত্ত্বা অনুভব কবিতে সক্ষম হইতে না? সেই আদিম বিশৃঙ্খলা ও আন্দোলনের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির অভিপ্রায় ও আয়োজন উজ্জ্বল অক্ষবে অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইতে না?

মূল পরমাণুর মধ্যেই যে অভিপ্রায় বর্ত্তমান, সে বিষয়ে আর একটী কথা বলিব। পরমাণুর সংগঠনেই অভিপ্রায় রহিয়াছে। যদি সকল পরমাণু এক প্রকার গুণবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে পবমাণু হইতে জগৎ হইত না। কেন না, তাহা হইলে রাসায়নিক সংযোগ অভাবে 'পঞ্চভূত' ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি অসম্ভব হইত। কেবল চিনিতে সন্দেশ হয় না, ছানা চিনি উভয়ের সহযোগ আবশ্যক।

আবার যদি পরমাণু সকল বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইত, অর্থাৎ যদি এমন হইত যে, কোন পরমাণুর সহিত কোন পর-

মাণু মিশে না ; তাহা হইলেও জগতের বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারিত না। কেন না, যাবতীয় পদার্থ, মূল পরমাণু নিচয়েব সংযোগ বিয়োগের ফল।

আবার যদি এমন হইত যে, সকল পরমাণু সকল পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইত ; তাহা হইলেও জগৎ হইত না। কেন না তাহা হইলে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব হইত। সমুদয় পরমাণু একত্রে মিশ্রিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড সমষ্টি উৎপন্ন হইত মাত্র।

আবার দেখ, বিশেষ বিশেষ পরিমাণ ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয় না। হাইড্রজিন ও অক্সিজিন মিলিলেই যে জল হয়, এমন নহে। বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন মিলিত হইলেই জল উৎপন্ন হয়। নাইট্রজিন ও অক্সিজিন একত্র হইলেই বায়ু হয়, এমন নহে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের এদিক্ ওদিক্ হইলে হইবে না।

কিন্তু চেতনাবিহীন অন্ধ জড় পরমাণুর মধ্যে পরিমাণ জ্ঞান ও সম্বন্ধবোধ কেমন করিয়া আসিল ? সম্বন্ধ ও পরিমাণ-বোধ জ্ঞানের ধর্ম্ম, জড়ের ধর্ম্ম নহে।

এই সকল বিচার করিলে বুঝা যায় যে, কেবল যে পরমাণু হইতে বিশ্বকৌশল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে। মূল পরমাণুতেই কৌশল ও অভিপ্রায় রহিয়াছে। সুতরাং মূল পরমাণুতেই জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় প্রকার বিবর্ত্তনবাদীগণ বলেন যে, জড় হইতে জন্তু

ও প্রাণী হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। এক প্রকার আদিম জীব হইতে কোটী প্রকার জীব কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল? কোন জীব যে সকল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা যে সকল অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোন কারণ বশতঃ সে সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সে নূতন অবস্থার উপযোগী শরীর ও মন লাভ করিতে থাকে। পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুণ সন্তান লাভ করে, ইহা স্বভাবের একটী নিয়ম। সুতরাং পিতামাতার পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি তাহাদের সন্তানেরা লাভ করিয়া থাকে। ক্রমে বংশ পরম্পরায় নূতন অবস্থার অনুপযোগী পুরাতন প্রকৃতি নষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার উপযোগী নূতন প্রকৃতির উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া জীবের শরীর মন সম্পূর্ণরূপে নূতন অবস্থার উপযুক্ত হয়। অথবা ইহা বলিলেও হয় যে, ক্রমে একটী নূতন প্রকার জীব হইয়া দাঁড়ায়।

শরীরের যে অঙ্গ বা মনের যে বৃত্তিকে অধিক চালনা করা হয়, সেই অঙ্গ ও বৃত্তি ক্রমে ততই প্রবল ও কার্য্যক্ষম হয়। আবার যে অঙ্গ বা বৃত্তির চালনা যে পরিমাণে অল্প হয়, সেই অঙ্গ বা বৃত্তি সেই পরিমাণে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই দ্বিতীয় প্রকার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নূতন অবস্থায় সমাগত প্রাণীর কোন কোন অঙ্গ বা বৃত্তির চালনা হ্রাস হওয়াতে সেগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এমন কি,

নষ্ট হইয়াও যায়। এইরূপে কোন কোন অঙ্গ ও বৃত্তির বিনাশ এবং অপর কতকগুলি অঙ্গ ও বৃত্তির উন্নতি বশত কালে একপ্রকার জীবের বংশে নূতনবিধ লক্ষণাক্রান্ত জীবঃ উৎপন্ন হয়।

এই বিবর্ত্তনবাদের মত সম্পূর্ণরূপে ও সকলস্থলে সত্য কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। এস্থলে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডিউক অব আর্গাইলের রচিত পুস্তক বিশেষে * তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হমিংবার্ড (humming bird) নামক এক পক্ষীজাতির মধ্যে বিবর্ত্তনবাদেব নিয়ম কার্য্য কবে নাই।

সে যাহা হউক, যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদের দোহাই দিয়া বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকাব করেন, আমি তাঁহাদের বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা বলেন যে, কোন জ্ঞান-সম্পন্ন কারণব্যতীত জগতের কৌশল সকল কেবল বিবর্ত্তন-বাদের নিয়মানুসাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের কথা নিতান্তই অযুক্ত।

একটী পরমাশ্চর্য্য কৌশলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের নিয়ম কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। সে কৌশল স্ত্রীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি। যে প্রাকৃতিক কৌশলে সংসারে জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কি সামান্য আশ্চর্য্য! স্ত্রী ও পুরুষজাতির দেহ মনের সম্বন্ধ কি

*"Reign of Law" by Duke of Argyle.

আশ্চর্য্য ব্যাপার! উভয় জাতির শরীর পরস্পরের উপযোগী; উভয় জাতির মন পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং সেই আকর্ষণ জনিত সম্মিলনের ফল সেই জাতীয় নূতন প্রাণীসৃষ্টি!

এই অদ্ভুত কৌশলটী না থাকিলে বিবর্ত্তনবাদ কোথায় থাকিত? যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম দ্বারা সমুদয় সৃষ্টি-কৌশল ব্যাখ্যা করিতে চান, তাঁহাদের জানা উচিত যে, একটী পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল অবলম্বন করিয়াই বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম প্রকৃতি রাজ্যে কার্য্য করিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই কৌশল। বিবর্ত্তন-বাদ কয়টা কৌশল ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ঐ যে পক্ষীটী আকাশে উড়িতেছে, উহার পক্ষের বিষয় একবার ভাব দেখি। মনুষ্য যাহা করিতে পারে না, পক্ষের সাহায্যে পক্ষী তাহাই করিতেছে। স্থিরচিত্তে ঐ পক্ষের রচনা কৌশল আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইতে হয়! পাখীর শরীর যদি আর একটু ভারি হইত, তবে পাখী উড়িতে পারিত না। যদি আর একটু লঘু হইত, তাহা হইলেও পাখী উড়িতে পারিত না; বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যাইত। পাখীর পাখা উদ্ঘাটিত ছাতার মত কেন? তাহা না হইলে উপরিস্থ বায়ুর চাপে পাখী উড়িতে পারিত না। পশ্চাতের দিকে ঐ কর্ণটী (হাল) কেন? বায়ুসাগরে পক্ষীর দেহরূপ তরণী চালাইবার জন্য। *

* পাখীর পাখায় কত গূঢ় কৌশল আছে, বুঝিতে হইলে "Reign of Law" নামক পুস্তকে উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করা আবশ্যক। অধ্যাপক Flint উক্ত অধ্যায়টীকে masterly বলিয়াছেন।

বৃক্ষ পল্লবের মধ্যে বসিয়া ঐ পাখীটী ডিম্বে তা দিতেছে কেন? উত্তাপ দ্বারা ডিম্ব ফুটাইবে? সে তো পদার্থবিদ্যা পাঠ করে নাই, তবে এ তত্ত্ব কেমন করিয়া জানিল? কে তাহাকে শিখাইল? ডিম্ব হইতে শাবক বাহির হইবে বলিয়া তাহার এত আগ্রহ? শাবক বাহির হইলে তাহার লাভ কি? শাবক কি তাহাকে রাজা করিবে? শাবকের সহিত তাহাদের কয় দিনের সম্বন্ধ? পক্ষী কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় পক্ষপুটে ডিম্ব ঢাকিয়া বসিয়া আছে? যে শক্তি এই সুবিশাল প্রকৃতি রাজ্য শাসন করিতেছে, সেই শক্তি ঐ অবোধ পক্ষীকে তাহার ডিম্বের উপর নিরন্তর বসাইয়া রাখিয়াছে।

আবার যখন সময়ক্রমে ডিম্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষীমাতার কত আগ্রহ ও যত্ন! কত কষ্টে কত স্থান হইতে আহার অন্বেষণ করিয়া শাবকগুলিকে মুখে মুখে খাওয়াইয়া দেয়! শত্রু হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য কত সতর্কতা! কুলায় নির্ম্মাণ হইতে শাবক গণকে শূন্যে উড়াইবার সময় পর্য্যন্ত পক্ষীর কার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পক্ষীমাতা এত করে কেন? পক্ষীমাতা কিছুই করে না। যিনি জগতের মাতা আদ্যাশক্তি ভগবতী, তিনিই জগতের শিশুগণকে সুকৌশলে রক্ষা করিতেছেন।

গাভী সদ্যপ্রসূত বৎসের শরীর কেমন প্রগাঢ় স্নেহের সহিত লেহন করে! কেহ বৎসের নিকট অগ্রসর হউক দেখি, অমনি দুটি শৃঙ্গ আন্দোলিত করিয়া গাভী ফোঁস্ করিয়া

উঠিবে। বৎসকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন ? বংশ রক্ষার জন্য মানুষ ব্যস্ত হয়, গরুর তো সে ভাবনা নাই।

এক প্রকার বোলতা আছে, তাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইলেই ভাবী সন্তানের জন্য আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। নানা স্থান হইতে উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া জমা করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির কেমন চমৎকার নিয়ম!. ডিম্ব প্রসব করিয়াই বোলতা মরিয়া গেল। এখন সেই সংগৃহীত খাদ্য রহিল, আর ডিম্বগুলি রহিল। ক্রমে ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত হইল; তাহাদের জন্য সংগৃহীত খাদ্য তাহাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। সেই খাদ্য আহার করিয়া তাহারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখ দেখি, কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার! বোল্‌তা যখন আহার সংগ্রহ করিতেছে, সে জানে না যে, সে কাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। এমন এক জনের জন্য সে পরিশ্রম করিতেছে, যাহাকে সে কখন দেখে নাই। আবার সেই খাদ্য যে খাইতেছে, সেও জানে না যে, কে তাহার জন্য উহা আহরণ করিল। আহরণকারী কখন তাহার ইন্দ্রিয়-বোধের বিষয় হয় নাই।

ইতর প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের অনেক কার্য্যে সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, অথচ সে অভিপ্রায় তাহাদের নিজের নহে। পক্ষী, গাভী ও বোল্‌তার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল, উহাতে এ কথাটী সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যে বোল্‌তার

কার্য্য বর্ণিত হইল, উহা শত কণ্ঠে প্রকৃতির অন্তর্ভূত জ্ঞানময়ী শক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

কেবল ইতর প্রাণী কেন? মনুষ্যও অনেক বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, অথচ তাহাতে আপনা আপনি একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়।

ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছে। শারীরিক অভাবমোচনের জন্য আহার আবশ্যক, একথা সে বড় হইয়া শিক্ষা করিবে। এখন প্রকৃতি তাহাকে বলপূর্ব্বক আহার করাইতেছে। কেবল শিশু কেন? প্রকৃতি মনুষ্য মাত্রকেই বলপূর্ব্বক আহার করাইতেছে। ক্ষুধা একটী স্বাভাবিক বিষয়; উহাতে স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। সে অভিপ্রায় মানুষের নিজের নহে। তবে কাহার? অভিপ্রায় জড়ের ধর্ম্ম নহে; জ্ঞানের ধর্ম্ম।

এক একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে এক একটী মাতব্বর সাক্ষী। প্রত্যেক প্রবৃত্তির মধ্যে এক একটী অভিপ্রায় রহিয়াছে; অথচ মনুষ্য বা অপর জীব বিচার বিতর্ক করিয়া সে অভিপ্রায় সৃষ্টি করে নাই। তবে উহা কাহার?

পল্লীগ্রামে অনেকে দেখিয়াছেন যে, কৃষকের গরু মাঠে পলাইয়া যায়। অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়াও গরুটাকে ধরা যায় না। তখন কৃষক এক আটি খড় হস্তে লইয়া "আয় আয়" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে, গরু খড়ের লোভে ক্রমে নিকটে আসে, কৃষকও অল্পে অল্পে পশ্চাৎপদ হইতে

থাকে। পরিশেষে গরু খড় খাইতে পায় বটে, কিন্তু কৃষক তাহাকে গোয়ালে বদ্ধ করে।

প্রকৃতির অন্তর্ভূতা শক্তি জীবদিগকে লইয়াও অনেক বিষয়ে এইরূপ কার্য্য করিতেছে। জীবগণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভের জন্য কত কার্য্য করিতেছে; অথচ তাহাতে বিশ্বব্যাপিনী শক্তির গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক প্রবৃত্তি, এবং কাম, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি, একথার অখণ্ডনীয় প্রমাণ স্থল।

যতই আলোচনা করিবে, ততই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডপতির উজ্জ্বল সত্তা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে। বেকন বলিয়াছেন, " I would rather believe in all the fables of the Talmud and the Alkoran, than that this universal frame is without a mind." "আমি তালমদ ও কোরাণের উপন্যাস সকল বরং বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এই বিশ্ব ব্যাপারে যে কোন জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

মহাত্মা কার্লাইল বলিয়াছেন ; "যাহারা তর্ক করিয়া পরমেশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে যায়, তাহারা সূর্য্য দেখিবার জন্য লণ্ঠন জ্বালে।" কি সুন্দর কথা! কেহ যদি যথার্থই বলে, ভাইরে! সূর্য্য দেখিতে হইবে, ঝাড়, লণ্ঠন, গ্যাসলাইট, তাড়িতালোক সব জ্বালিয়া দেও, আমরা তাহাকে বাতুল মনে করি। বাস্তবিক যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বিশ্বাস করিতে চায় যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি

ভঙ্গের কারণ, নতুবা বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার হৃদয় মন নিশ্চয়ই বিকৃত অবস্থাপন্ন।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, মানব জাতি কখনই ভগবানকে ছাড়িতে পারিবে না। উহা মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁহাকে ছাড়িলে, কি থাকে? ইহ সংসার কি ভয়াবহ শ্মশান ভূমি হইয়া যায় না? যাহার তিন কুলে কেহ নাই, লোকে তাহাকে দুর্ভাগ্য বলে। সে নিজেও আপনাকে ভাগ্যহীন মনে করিয়া ম্রিয়মান্ হয়। তবে নাস্তিকের তুল্য দুর্ভাগ্য কে আছে? তিন কুল কেন? নাস্তিকের ত্রিজগতে কেহ নাই।

মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না ?

"সকলই আপনা আপনি হইয়াছে, পরমেশ্বর নাই" ইহা ষোল আনা নাস্তিকের কথা। "পরমেশ্বর আছেন কি না নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না" ইহা সন্দেহবাদীর কথা। "এই ব্রহ্মাণ্ড এক আদি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আদিকারণের স্বরূপ মনুষ্যের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়" ইহা অজ্ঞেয়তাবাদীর কথা। অজ্ঞেয়তাবাদী, জ্ঞান, কি দয়া, কি প্রেম কোন গুণই পরমেশ্বরে আরোপ করিতে চাহেন না। তিনি বলেন, মূল কারণ আছেন, এই মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না। বর্ত্তমান সময়ে এই অজ্ঞেয়তাবাদ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত দলে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

কেমন করিয়া জানিলে অজ্ঞেয় ?

অজ্ঞেয়তাবাদীকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। যদি বিশ্বকারণের বিষয় কিছুই জান না, তবে কেমন করিয়া জানিলে যে তিনি অজ্ঞেয় ? যদি এ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে না পারিয়া থাক, বল যে তিনি অজ্ঞাত; অজ্ঞেয় বলিবার অধিকার কি ? তুমি বলিতেছ যে, মানুষের পক্ষে পরমেশ্বরকে জানা অসম্ভ [illegible] তুমি অবশ্য তাঁহার বিষয় এমন কিছু জানিয়াছ, [illegible] তছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না। ঐ গরুটাকে অজ্ঞেয় বল না কেন ? তুমি উহাতে এমন

কিছু দেখিতেছ না, যে জন্য উহাকে অজ্ঞেয় বলা যুক্তিযুক্ত মনে কর। সুতরাং তোমাকে ইহা বলিতেই হইবে যে, তুমি বিশ্বকারণের বিষয়ে এমন কিছু জানিয়াছ যে জন্য তুমি বলিতেছ যে, তাহাকে জানা যায় না।

আমি যে পদার্থকে যথার্থই জানি না, তাহার বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না। তাহা অজ্ঞেয় কি জ্ঞেয়, এ উভয়ের মধ্যে কিছুই জানি না। যাহার বিষয় কিছুই জানি না, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞানভূমির অতীত স্থানে স্থিতি করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ধৃষ্টতা নহে?

কিন্তু অজ্ঞেয়তাবাদী নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে, আদি-কারণ অজ্ঞেয়। তিনি অবশ্য আদিকারণ সম্বন্ধে এমন কিছু জানিয়াছেন, যে জন্য এ কথা বলিতে সাহস করিতেছেন। তবে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইল? জ্ঞাত অজ্ঞেয়, "সোণার পাথরবাটী" কি কখন হয়? যে জন্য বলিতেছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না, সেই জন্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে জানা যায়।

লক্ষণ-জ্ঞান ব্যতীত এক প্রকার পদার্থ হইতে অন্য প্রকার পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় না। পর্ব্বত বৃক্ষ নয়, বৃক্ষ পর্ব্বত নয়; নদী সমুদ্র নয়, সমুদ্র নদী নয়; হস্তী পিপীলিকা নয়, পিপীলিকা হস্তী নয়; মনুষ্য গরু নয়, গরু মনুষ্য নয়; এই সকল পার্থক্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখিয়াই উৎপন্ন হয়। পিপীলিকাতে এমন কতক্‌গুলি লক্ষণ আছে, যাহা

হস্তীতে নাই; আবাব হস্তীতে এমন কতক্‌গুলি লক্ষণ আছে, যাহা পিপীলিকাতে নাই। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, পিপীলিকা হস্তী নয়, এবং হস্তী পিপীলিকা নয়। সেইরূপ যদি জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, এই দুই প্রকাবে পদার্থ বিভাগ কর, তাহা হইলে এই উভয়বিধ পদার্থেরই লক্ষণ জানা চাই। কি লক্ষণ থাকিলে জ্ঞেয় পদার্থ হয়, এবং কি লক্ষণ থাকিলে অজ্ঞেয় পদার্থ হয়, তাহা না জানিলে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের প্রভেদ কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কিন্তু যদি লক্ষণ জানা গেল, তবে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইল? যাহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছ, তাহা অবশ্য আংশিক রূপে জ্ঞেয়। তবে আর অজ্ঞেয়তাবাদি কোথায় রহিল?

অনন্তকে কি জানা যায়?

কিন্তু তিনি অনন্ত। আমি পরিমিত হইয়া অনন্তকে কেমন করিয়া জানিব? একথাটী অনেকেই বলেন। সফরী কি সাগর পার হইতে পারে? ক্ষুদ্র পক্ষী কি আকাশ প্রদক্ষিণ করিতে পারে?

মনুষ্য কি অনন্তকে জানিতে পারে না? তবে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই অনন্ত-অর্থ-বোধক শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? অনন্ত—এই শব্দটী বলিলে লোকের মনে অবশ্য একটী অর্থবোধ হয়। অর্থবোধ না হইলে উক্ত শব্দের ব্যবহার থাকিত না। যখন অনন্ত শব্দটী বলিলেই

তাহার অর্থবোধ হইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব ?

যদি অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব হয়, তবে কেমন করিয়া জানিলে যে অনন্ত আছে ? অনন্ত ও "আকাশ কুসুম" কি একই অর্থ প্রকাশ করে ? "আমি অনন্তকে জানি না" এমন কথা না বলিয়া ইহাই কেন বল না যে, অনন্ত বলিয়া কিছু নাই ! একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যদি বলিতে পারি যে, অনন্ত আছে, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, অনন্তকে জানি। না জানিলে কেমন করিয়া বলিব, আছে ?

অনন্তকে বুঝা যায় না বলিলে কি বুঝায় ? ইহাই বুঝায় যে, অনন্তকে বুঝি। যদি অনন্তের কোন জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে অনন্তকে বুঝা যায় কি না যায়, এ দুয়ের কিছুই জানিতাম না। যদি তুমি নিশ্চয় করিয়া বল যে, মনুষ্য অনন্তকে কোন ক্রমেই জানিতে পারে না, তাহা হইলে তুমি অনন্তের বিষয়ে অবশ্য এমন কিছু জান, যে জন্য তুমি বলিতেছ যে অনন্তকে জানা যায় না। অনন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলে, মনুষ্য অনন্তকে জানিতে পারে না, এমন কথা বলিবার অধিকার থাকে না। যাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কেমন করিয়া বলিব যে তাহা অজ্ঞেয় ? অনন্তকে না জানিলে কেহ বলিতে পারে না যে, অনন্তকে জানা যায় না। এক প্রকার খেলাতে বালকেরা তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু বাঁধিয়া অপর সকলে একে একে অঙ্গুলি দ্বারা তাহার

মস্তকে আঘাত করিতে থাকে। যাহার চক্ষু বাঁধা হইয়াছে, সে তাহাদের ধরিতে চেষ্টা করে। যে ভাল মানুষ, সে হাত নাড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দুষ্ট ছেলে কাপড়ের ভিতর দিয়া ঈষৎ একটু দেখিয়া লয়; অথচ এমনি ভাব প্রকাশ করে, যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছে না।

পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। দীর্ঘ কি? যাহা হ্রস্ব নয়। হ্রস্ব কি? যাহা দীর্ঘ নয়। ভাল কি? যাহা মন্দ নয়। মন্দ কি? যাহা ভাল নয়। পরিমিত কি? যাহা অনন্ত নয়। অনন্ত কি? যাহা পরিমিত নয়। বিপরীত পদার্থের জ্ঞান একত্রে বাস করে। যখন আমাদের পরিমিতের জ্ঞান আছে, তখন অনন্তের জ্ঞানও অবশ্য আছে।

প্রত্যেক পরিমিত পদার্থ অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, তারা সকলই অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। সামান্য তৃণকণা, সামান্য ইষ্টক খণ্ড অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। সমুদ্র ও জলবিন্দু, হিমাচল ও বালুকণিকা, সমভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। যাহা কিছু দেখি, তাহাতে অনন্ত প্রকাশিত। দূরে কেন যাই? আমি নিজে পরিমিত, সুতরাং আমাতেই অনন্ত প্রকাশিত।

তবে, "অনন্তকে জানি না" এ কথার কি কোন অর্থ নাই? আছে বই কি! অনন্তের ধারণা হয় না। অনন্ত তো দূরের কথা। সকল পরিমিত পদার্থেরই কি ধারণা হয়? এই পৃথিবীটা কত বড় ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে না। পৃথিবী কেন? হিমালয় পর্ব্বত কত বড় ভাব দেখি;

ধারণা করিতে পারিবে না। হিমালয় কেন? একটা সামান্ত বাড়ী, একটা বৃক্ষকে ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে না। বাড়ীর ভিত্তি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত, এবং দৈর্ঘ ও বিস্তারে সমুদয় স্থান একসঙ্গে ভাব দেখি; কথনই পরিষ্কার ধারণা হইবে না। একটা বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব লইয়া সমগ্র বৃক্ষ ভাব দেখি; পারিবে না। মানুষের মন এত ক্ষুদ্র। যখন পবিমিত পদার্থেরই পবিষ্কার ধারণা হয় না. তখন অনন্তের ধারণা কি সম্ভব?

আদিকারণ কি আত্মপ্রকাশে অক্ষম?

অজ্ঞেয়তাবাদ লইয়া বিচার কবিতে হইলে দুটী বিষয় দেখা আবশ্যক। প্রথম মানুষের এমন ক্ষমতা আছে কি না যে, জগতের আদিকারণকে জানিতে পারে। দ্বিতীয় আদিকারণের এমন ক্ষমতা আছে কি না যে, তিনি মানুষের নিকট প্রকাশিত হন। আদিকাবণের সে ক্ষমতা আছে কি? অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের শিরোভূষণ হার্বার্ট স্পেন্‌সর্ আদিকারণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন;—

"Thus the Eirst Cause must be in every sense, Perfect, complete, total: including within itself all Power and transcending all Law."

এ কথার মর্ম্ম এই যে, "আদিকারণ সকল প্রকার অর্থেই পূর্ণ। তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি রহিয়াছে; এবং তিনি সকল নিয়মের অতীত।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আদিকারণ যদি সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত হন, তাহা হইলে

তিনি আপনার স্বরূপ-লক্ষণ মনুষ্যকে জানাইতে পারিবেন না কেন ? সর্ব্বশক্তিমান্ কি আত্মপ্রকাশে অক্ষম ? যিনি সর্ব্বত্র স্থিতি করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্যের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন না ? যদি বল, পারেন না, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত কেমন করিয়া হইলেন ? যদি বল পারেন, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ কোথায় থাকিল ?

অজ্ঞেয়তাবাদ বলিতেছে. মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বকারণের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি স্বীকার করিলে অসম্ভাবনা থাকে কই ? অজ্ঞেয়তাবাদ কি অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে ? যদি তুমি বিশ্বকারণকে অজ্ঞেয় বল, অথচ তাঁহার অনন্ত-শক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে কি তুমি এক মুখে দুই বিপরীত কথা বল না ?

আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কথা বলিয়াছেন।—

"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না"।

এই শ্লোকটীর প্রথমাংশে পরমেশ্বরকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে যে, যিনি সেই পরমেশ্বরের আনন্দ জানিয়াছেন, তিনি

কাহাকেও ভয় করেন না। এই দুটী কথা কি পরস্পর বিরোধী নহে? যিনি বাক্য মনের অগোচর, তাঁহার আনন্দ কেমন করিয়া জানা যাইবে? যদি তিনি জীবের হৃদয়ে আপনার আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই জীব তাহা জানিতে পারে। পরমেশ্বর যে আপনাকে প্রকাশ করেন, মহর্ষিগণ অধ্যাত্মযোগদ্বারা তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। উপনিষদের আর একটী শ্লোক দেখুন;—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

"অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধাদ্বারা অথবা বহু শ্রবণদ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন"।

অজ্ঞেয়তাবাদের অসঙ্গতিদোষ।

নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদ, অবশ্য, সত্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, অজ্ঞেয়তাবাদ অধিকতর অসঙ্গতি দোষযুক্ত। পরমেশ্বর আছেন, অথচ তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ অজ্ঞেয়, এ দুই কথা পরস্পর মিলে না। পরমেশ্বর আছেন কেন বলিতেছ? তিনি আছেন, এ কথা বলিবার যে কারণ, সেই কারণই কি তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া দিতেছে না? যদি সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া বল, তিনি আছেন, সৃষ্টিকৌশল কি তাঁহার জ্ঞানের কথা বলি-

তেছে না ? যদি বিবেকের বাণী শুনিয়া বল, তিনি আছেন, বিবেক কি তাঁহাকে "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে না ? যদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিয়া বল তিনি আছেন, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি তাঁহাকে শক্তিরূপী বলিয়া প্রচার করিতেছে না ?

অজ্ঞেয়তাবাদী প্রথম দুইটী কারণ স্বীকার করেন না। শেষটী করেন ; সুতরাং শেষটী লইয়া একটু আলোচনা করিব। প্রথমেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আদিকারণ সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞেয়, তবে তাঁহার শক্তির কথা বল কেন ? যদি কিছুই জানা যায় না, তবে কেমন করিয়া শক্তির বিষয় জানা গেল ? শক্তি কি একটী স্বরূপ লক্ষণ নহে ? যদি বল শক্তি ভিন্ন আর কিছু জানা যায় না, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইলেন ? শক্তি স্বীকার করিলে কি তাঁহাকে আংশিকরূপে জ্ঞেয় বলা হয় না ?

কিন্তু শক্তি ভিন্ন আর কিছু স্বীকার না করিবার কোন অর্থ নাই। শক্তি মানিলে, ইচ্ছা ও জ্ঞান মানিতেই হইবে। অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, আমরা যাহাকে শক্তি বলি, তাহা ইচ্ছা ও জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে। এক জ্ঞানময়ী অনন্ত-শক্তি অনন্ত ভুবনে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে।

শক্তি কি ?

শক্তি কি ? যাহা পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। অগ্নির সহিত হস্তের সংস্পর্শ হইল, হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল। একটী মৃন্ময়

স্না কাচপাত্রে তুমি পদাঘাৎ করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইল, অমনি বিদ্যুল্লতা ঝলসিয়া উঠিল। হরির পৃষ্ঠে রাম মুষ্ট্যাঘাৎ করিল, পৃষ্ঠে বেদনা হইল। এই সকল স্থলেই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেই পরিবর্ত্তনের মূলে শক্তি বিদ্যমান। অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তি কার্য্য করিতেছে! পক্ষীর কলরবে, প্রাণীদেহের শোণিত ধারে, নদীর স্রোতে, সাগরের তরঙ্গে, বায়ুর হিল্লোলে, গ্রহের গতিতে, সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন; সর্ব্বত্র শক্তির কার্য্য।

অনন্ত ভুবন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে। উত্তাপ সংযোগে জল বাষ্প হয়; যেখানে উত্তাপের সহিত জলের যোগ, সেই খানেই জলের বাষ্পরূপে পরিণতি। প্রথম ঘটনাটী উপস্থিত হইলেই দ্বিতীয় ঘটনাটী উপস্থিত হয়। শুষ্কপত্র অগ্নিতে দেও, দগ্ধ হইবে। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত কর, লোহিত বর্ণ হইবে। ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ কর, ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। এই প্রকার সমুদয় স্থলে একটী ঘটনা ঘটিলে আর একটী ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। প্রথমটীকে কারণ বলে, দ্বিতীয়টীকে কার্য্য বলে। অগ্নির সহিত হস্তের সংশ্রব কারণ, হস্ত দগ্ধ হওয়া কার্য্য। কাচপাত্রে আঘাত কারণ, পাত্র ভগ্ন হওয়া কার্য্য। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ কারণ, বিদ্যুৎ উৎপত্তি কার্য্য। হরির পৃষ্ঠে রামের মুষ্ট্যাঘাত কারণ, পৃষ্ঠে বিশেষ-প্রকার ইন্দ্রিয় বোধ কার্য্য।

কিন্তু একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা হইলেই কি

প্রথমটী কারণ ও দ্বিতীয়টী কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে ? বৃক্ষে একটী ফল পাকিয়া রহিয়াছে ; উহার উপরে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল, ফলটী অমনি পড়িয়া গেল। এস্থলে ফলটী পড়িল কেন ? পক্ষী বসিল বলিয়া ফলটী পড়িল, না, ফলটী পাকিয়া আপনি বৃন্তচ্যুত হইল ? যদি দেখিতাম যে, যেখানে যখন পক্ষী ফলের উপরে বসে, সেখানে তখনই ফল পড়ে, অন্য প্রকারে পড়ে না, তাহা হইলে বলিতাম যে, পক্ষীর বসাই ফল পড়ার কারণ। কিন্তু দেখিতেছি যে, ফল নানা কারণে বৃন্তচ্যুত হয় ;—সুপক্ক হইয়া আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হয়। সুতরাং ফলের উপরে পক্ষীর উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরে ফল পতিত হইলেও প্রথম ঘটনাটী কারণ ও দ্বিতীয় ঘটনাটী কার্য্য না হইতে পারে।

কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সকল স্থানে ও কালে একটী বিশেষ ঘটনার পর আর একটী বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইলেই কি প্রথমটীকে কারণ ও দ্বিতীয়টীকে কার্য্য বলিব ? যেখানে যখন চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হয়, সেখানে তখনই উহা লোহিত বর্ণ হয়। সুতরাং চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হওয়া কারণ, এবং লোহিত বর্ণের উৎপত্তি, কার্য্য।

সকল স্থলেই কি সেইরূপ ? দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন হইতেছে। এ নিয়মের ব্যভিচার কখন দেখি নাই। তাই বলিয়া কি বলিব যে, দিন রাত্রির কারণ, অথবা রাত্রি দিনের কারণ ? আমাদের নৈয়ায়িকেরা কারণের লক্ষণা করিয়াছেন ; "নিয়তঃ পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ" যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী,

তাহাই কারণ। এই লক্ষণা অনুসারে দিন রাত্রির কারণ, এবং রাত্রি দিনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দিন রাত্রির মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই, সহজেই বুঝা যায়। সূর্য্যোদয় ভিন্ন দিন হয় না, এবং সূর্য্যাস্ত ভিন্ন রাত্রি হয় না; সুতরাং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তই দিন ও রাত্রির কারণ।

তবে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই কারণ; এবং অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহা পর-বর্ত্তী, তাহাই কার্য্য। সূর্য্যোদয় রূপ ঘটনাটী না ঘটিলে রাত্রি কখন দিনেব পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পাবে না; এবং সূর্য্যাস্তরূপ ঘটনাটী না ঘটিলে দিন কখন রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। সেই জন্য দিন বাত্রির মধ্যে কার্য্য কাবণ সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যোদয় হইলেই দিন হয়; সূর্য্যাস্ত হইলেই রাত্রি হয়; অন্য কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না,—সুতরাং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তই দিন রাত্রির কারণ।

ইহাই যদি কার্য্য ও কারণ হইল, তবে শক্তি কোথায়? একটী ঘটনা আগে ঘটিতেছে, আর একটী পবে ঘটিতেছে, ইহা ভিন্ন তো আর কিছু দেখিতেছি না। যাহাকে কার্য্য কারণ শৃঙ্খল বলিতেছি, তাহা একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা ভিন্ন কিছুই নহে। শক্তি কোথায়?

আর এক প্রকারে আলোচনা করা যাউক। শক্তি কি পদার্থ? জড়পদার্থ না জ্ঞান পদার্থ? অথবা জড় ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনরূপ পদার্থ? শক্তি যদি পদার্থের গুণ হয়, তবে উহা

জড়ের গুণ কি মনের গুণ ? অথবা জড় ও মন ভিন্ন অন্য কোনরূপ পদার্থের গুণ ?

প্রথমতঃ শক্তি যদি জড় বা জড়ীয় গুণ হয়, তাহা হইলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অবশ্য উহাকে জানা যাইবে। কিন্তু চক্ষু দ্বারা শক্তি দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শুনা যায় না ; ত্বক দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, শারীরিক কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতি উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রও শক্তির সংবাদ বলিতে পারে না।

শরীরের দ্বারা যে শক্তিকে জানা যায় না, একথা অনেকেই বুঝিবেন না। পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠ দেশে একজন ধাক্কা দিল। আমি কি তখন শক্তি অনুভব করিলাম না ? তবে কি অনুভব করিলাম ? ইন্দ্রিয় বোধ (Sensation) ও গতি (Motion)। যে সকল স্থলে আমরা বোধ করি যে, শরীরের দ্বারা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই সকল স্থলে আমরা বাস্তবিক ইন্দ্রিয়বোধ অথবা গতি ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করি না। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ও গতির উৎপত্তির কারণ যে শক্তি, তাহা কখনই অনুভব করিতে পারি না। মাংস পেশীতে কি শক্তি অনুভব করা যায় না ? অনেক বুদ্ধিমান লোকেও মনে করেন যে, তাঁহারা মাংস পেশীতে শক্তি অনুভব করেন। বাস্তবিক মাংস পেশীতেই হউক, অথবা শরীরের যে কোন অংশেই হউক, এক প্রকার ইন্দ্রিয় বোধ ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না।

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, শক্তি জড় বটে, কিন্তু

যারপরনাই সূক্ষ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয়ের অতীত, এমন কি অনুবীক্ষণ যন্ত্রেরও অতীত। সে কথা বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কার্য্য কারণ শৃঙ্খল পরীক্ষা করিলে, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা লক্ষিত হয়। প্রথমটীকে কারণ বলে, দ্বিতীয়টীকে কার্য্য বলে। শক্তি যদি কোথাও থাকে, তবে উহা কার্য্য কাবণ শৃঙ্খলেই থাকিবে। কিন্তু কই? পরে পরে দুটী ঘটনা হইল; ঐ দুটী ঘটনার মধ্যে এমন কিছু দেখিতেছি না, যাহা উভয়কে যোগ করিতেছে।

চক্ষুর অতীত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহা কার্য্য ও কারণকে যুক্ত করে, এবং তাহাই শক্তি, এরূপ হইতে পারে না। সেই সূক্ষ্ম পদার্থ অবশ্য প্রথম কারণে (প্রথমঘটনায়) থাকে; তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া উহা কার্য্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে আসে। এখানে দেখ, এই সূক্ষ্মপদার্থ (যাহাকে শক্তি বলিতেছ) উহার নিঃসরণ একটী ঘটনা, এবং উহা নিঃসৃত হইলে পর যাহা হয়, তাহা আর একটী ঘটনামাত্র; এ উভয়ের মধ্যে যোগ কোথায়? কেবল পরে পরে দুটী ঘটনা ঘটিল বই তো নয়। ভাবিতে গেলে কি ভাবিব? শক্তি নামে একটী সূক্ষ্ম পদার্থ নিঃসৃত হইল, তারপর একটী ঘটনা হইল। পরে পরে দুটী ঘটনা হইল; কিন্তু কে বলিল যে, প্রথম ঘটনাটী দ্বিতীয় ঘটনাটীকে উৎপন্ন করিল? প্রথম ঘটনাটী ঘটিবামাত্র একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় ঘটনা অথবা কার্য্য। কিন্তু প্রথম ঘটনা হইতে যে দ্বিতীয় ঘটনার উৎপত্তি, একথার প্রমাণ

কি ? যদি কোন সূক্ষ্ম পাদর্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে, (যাহাকে শক্তি বলিতেছ.), তবে তাহা একটী ঘটনা মাত্র ; সেই ঘটনা হইতে যে দ্বিতীয় ঘটনা প্রসূত হইল, এমন কথা কেন বল ? পরে পরে দুটী ঘটনা হইল, এই কথা বলিলেই তো হয় ? ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে দ্বিতীয় ঘটনার উৎপত্তি যদি প্রমাণ না হইল, তবে উহাকে কেমন করিযা শক্তি বলিব ? যাহা পরিবর্ত্তন করে,—ঘটনার উৎপত্তি করে,—তাহাই শক্তি ; সুতরাং ঐ সূক্ষ্ম পদার্থকে শক্তি বলিতে পারি না। যদি ঐ প্রকার কিছু থাকে, উহা এক প্রকার সূক্ষ্ম জডমাত্র।

যাহা শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড় বা জড়ীয় গুণ। জড় যদি সূক্ষ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয় গোচর না হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি আরও অধিক হইলে অথবা অনুবীক্ষণ যন্ত্র আরও ভাল হইলে উহা ইন্দ্রিয়-গোচর হইত। কিন্তু প্রদর্শিত হইল যে, শারীরিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শক্তিকে কথনই জানা যায় না ;—জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে শক্তি জড় বা জড়ীয় গুণ নহে।

তবে কি জড় জগতে শক্তি বলিয়া কিছু নাই ? কেবল পূর্ব্ব-বর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাশ্রেণী রহিয়াছে ? একথা মনুষ্যের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বজ্রাঘাতে গৃহের ছাদ ভগ্ন হইয়া গেল, পদাঘাতে কাচপাত্র চূর্ণ হইল, লগুড়াঘাতে মেরুদণ্ড দ্বিখণ্ড হইল, ইহার মধ্যে কোন শক্তি কার্য্য করিল না, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, ইহা কেহ মনে করিতে পারে না। ঝড় হইয়া পৃথিবী তোলপাড় হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে

শত শত গৃহ ভস্মীভূত হইল, ভূকম্পে লিস্‌বন্ নগর বিনষ্ট হইল। অথচ এই সকল ঘটনার মূলে কোন শক্তি কার্য্য করিল না, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল, মনুষ্য ইহা মনে করিতে পারে না। জড় জগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক দেখিয়া দেখিয়া একটা সংস্কার জন্মে। তার পর বৈজিক নিয়ম (Law of heridity) অনুসারে উহা বংশ পরম্পরায় চলিতে থাকে। শক্তি সম্বন্ধীয় সংস্কার সেইরূপ বংশ পরম্পরায় চলিতেছে। একথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। এস্থলে ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা কোথায়? যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া জন্মিবে? "মাথা নাই, মাথা ধরা" কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

এমনও কেহ বলিতে পারেন যে, লোকে অনুমান-দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কিন্তু একটা মূল ভিন্ন অনুমান চলে না। কি দেখিয়া অনুমান করিবে? ঘটনার পর ঘটনা হইতেছে। একটী ঘটনা দেখিয়া আর একটী ঘটনা অনুমিত হইতে পারে; শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

কেহ কেহ এমনও বলেন যে, শক্তির জ্ঞান ভ্রমমাত্র। শক্তি বলিয়া কিছু নাই। এসম্বন্ধে দুটী কথা বলিব। প্রথমতঃ, যদি ইহা ভ্রম হয়, তবে এ ভ্রম কোথা হইতে আসিল? ভ্রমেরও কারণ আছে। শক্তি বিষয়ক ভ্রমের কারণ কি?

রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সত্য ; কিন্তু সর্পের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে সর্প ভ্রম হয় না। সর্প দেখিয়াছি বলিয়া সর্পের জ্ঞান হইয়াছে। শক্তিকে তো দেখি নাই, তবে শক্তির জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ?

দ্বিতীয়তঃ, শক্তিতে বিশ্বাস স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও বিশ্বব্যাপী। এরূপ বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিলে জগতে আর সত্য থাকে না। সকল যুক্তির মূলে স্বাভাবিক বিশ্বাস ; সকল বিজ্ঞানের পত্তনভূমি স্বাভাবিক বিশ্বাসকে না মানিলে কিছুই থাকে না। এ জগৎ আছে কে বলিল ? আমি আছি তাহার প্রমাণ কি ? সমুদয় সত্য যেখানে দণ্ডায়মান, শক্তির অস্তিত্ব-রূপ মহান্ সত্য সেই ভিত্তিমূলেই প্রতিষ্ঠিত।

অন্ধশক্তি অর্থশূন্য বাক্য।

আর এক প্রকারে শক্তি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সকলেই বলেন যে, আগুনের দাহিকা শক্তি আছে। দাহিকা শক্তির অর্থ কি ? আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, এ কথার অবশ্য অর্থ এই যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু কেমন করিয়া জানিলে যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে ? তুমি এই সহজ প্রশ্নের এই সহজ উত্তর দিবে ; "সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে, আগুন পদার্থ সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেই জন্যই বলি যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে ; সেই জন্যই জানিয়াছি যে, আগুনের দাহিকাশক্তি আছে।"

আমি বলি, আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে,—আগুন

যে পদার্থ সকলকে দগ্ধ করে, ইহা কেহ কখন দেখে নাই, দেখিতে পায় না।

তুমি বলিবে, "সে কি কথা। শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নিতে দেও দেখি, এখনই দেখিবে, অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতেছে।" আমি বলি তাহা কথনই দেখিতে পাইব না, কখন দেখা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগুনে কাঠ দিলে কেবল দুটী ঘটনা পরে পরে দেখা যায়। প্রথম ঘটনা এই দেখি যে, অগ্নির সহিত কাষ্ঠের সংশ্রব হইল; দ্বিতীয় ঘটনা এই দেখি যে, কাষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে। অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ দিলে পরে পরে এই দুটী ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রথম ঘটনার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় ঘটনাটী সংঘটিত হয়।

আগুনের সহিত কাষ্ঠের সংশ্রব হইল, আর কাষ্ঠ দগ্ধ হইতে লাগিল। এই দুটী ঘটনা ভিন্ন মানুষ আর কিছু দেখিতে পায় না। তবে কেন বল, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে? বলিতে পার, অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; কিন্তু অগ্নি যে কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতেছে, ইহা কি কখন দেখিয়াছ?

কেহ কখন দেখে নাই। তবে কেন বল, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে? সেইরূপ, কখন কি দেখিয়াছ যে, জল শীতল করিতেছে? কখনই না। (১) শীতল জলের সহিত পদার্থের সংশ্রব হইল, এবং (২) উহা শীতল হইল, ইহা ভিন্ন আর কেহ কিছু দেখিতে পায় না।

জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, ইহাও কি কখন দেখিয়াছ? (১) তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পান করিলাম, আর (২) তৃষ্ণা

নিবাবিত হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তুমি কবিয়াছ, সকলেই কবিয়াছে। কিন্তু শীতল জল তৃষ্ণা নিবাবণ কবিল, ইহা কেহই কখন প্রত্যক্ষ কবে নাই।

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা কবিলেই বুঝা যায় যে, বহির্জগতে আমবা পদার্থ ও ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ কবি। কিন্তু কোন একটী পদার্থ অপব কোন একটী পদার্থকে উৎপন্ন করিল, অথবা কোন একটী ঘটনা অপব কোন একটী ঘটনাকে উৎপন্ন করিল, ইহা কখন প্রত্যক্ষ কবি না। পরে পরে ঘটনা সকল ঘটিতেছে, এইমাত্র দেখিতে পাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। উৎপাদন ক্রিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় নহে ;— বিশ্বাসেব বিষয়।

যখন উৎপাদন করা বা উৎপাদিত হওয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইল না, তখন শক্তি কেমন কবিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে ?

শক্তি বলিলে আমবা কি বুঝি ? শক্তি কি ? যাহা উৎপাদন বা পবিবর্ত্তন কবে। * কিন্তু উৎপাদান কবিতেছে বা পবিবর্ত্তন কবিতেছে, ইহা যখন প্রত্যক্ষেব বিষয় নহে, তখন শক্তি কেমন কবিয়া প্রত্যক্ষেব বিষয় হইবে ? অগ্নির দাহিকা

* শক্তির লক্ষণা কবিতে হইলে, "যাহা পরিবর্ত্তন করে," এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়। পূর্ব্বে সেই রূপই বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল অধিক স্পষ্ট করিবার জন্য 'উৎপাদন' শব্দ ব্যবহৃত হইল। একটীও পরমাণু উৎপাদিত হইতে পারে না ; ঘটনা উৎপাদিত হয়। কিন্তু পরমাণু বা ঘটনা যাহাই কেন উৎপাদিত হউকনা, পরিবর্ত্তন শব্দই যথেষ্ট। ছিল না, হইল ; এই পরিবর্ত্তন।

শক্তি, জল বা বরফের শীতল করিবার শক্তি, অন্নাহারের ক্ষুধা নিবারণ শক্তি, জলস্রোতের ভাসাইয়া লইবার শক্তি, বায়ুর উড়াইয়া দিবার শক্তি, বজ্রের ভাঙ্গিয়া ফেলিবার শক্তি, প্রভৃতি বহির্জগতের কোন শক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।

শক্তি যে কোন প্রকার স্থূল অথবা সূক্ষ্ম জড় নহে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, শক্তি কোন রূপ জড়ীয় গুণ কি না? জড়ীয় গুণ কাহাকে বলে? যাহা চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড়ীয় গুণ। * শক্তি চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সুতরাং শক্তি জড়ীয় গুণ নহে।

শক্তি যখন জড় অথবা জড়ীয় গুণ হইল না, তখন শক্তিকে কি বলিব? যাহা জড় † বা জড়ের গুণ নহে, তাহা অবশ্য আত্মা বা আত্মার গুণ। কেন? জড় ও আত্মা ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন পদার্থ কি থাকিতে পারে না? কেন পারিবে না? অবশ্য পারে। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না! আমাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় বা

---

* চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়, জড়ীয় গুণ ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারে না। আবার জড়ীয় গুণ সকল চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য প্রকারে জ্ঞেয় নহে। সুতরাং যাহা চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তাহাই জড়ীয় গুণ, এইরূপ বলিলেই জড়ীয় গুণের সর্ব্বোত্তম লক্ষণা হয়।

† জড়ীয় গুণ ভিন্ন গুণাধার জড় কিছু আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জড় শব্দ সামান্যতঃ জড়পদার্থ অর্থেই ব্যবহৃত হইল।

শক্তি নাই, যদ্দ্বারা জড় ও আত্মার অতীত কোন পদার্থকে জানিতে পারি। সেরূপ কোন পদার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান। সুতরাং শক্তি যদি জড়ীয় গুণ না হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য আত্মার গুণ হইবে।

বহির্জগতে শক্তিকে দেখিতে পাইলাম না। এখন তাহার অন্বেষণার্থ অন্তর্জগতে প্রবেশ করি। বহির্জগতে যেমন ঘটনাব পর ঘটনা, অন্তর্জগতেও সেইরূপ ঘটনার পর ঘটনা; একটী মানসিক অবস্থার পর আর একটি মানসিক অবস্থা। জড়জগতে যেমন নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিয়ত নিরপেক্ষ পরবর্ত্তী ঘটনা রহিয়াছে, মনোজগতেও সেইরূপ। তবে কি বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও শক্তিকে দেখিতে পাইব না?

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া যাহাকে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, আপনার অন্তরেই তাহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা যায়। অন্তরেই শক্তি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।

বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও ঘটনার পর ঘটনা, অবিরল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু এখানে এমন কিছু আছে, যাহা বহির্জগতে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাহা কি?

প্রত্যেক মনুষ্য আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকে; আমি করিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই অনুভূত বিষয়। আমি চিন্তা করি, অনুভব করি, ইচ্ছা করি,

ইহা প্রত্যেক মনুষ্যই জানিতেছেন। আপনার কর্তৃত্ব মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়।

পদে পদে জানিতেছি যে, আমি কর্ত্তা; আপনার কর্তৃত্ব অনুভব করিতেছি। কর্তৃত্ব অনুভূতিব সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অনুভব করিতেছি। শক্তি ব্যতীত কর্ত্তৃত্বের কোন অর্থই নাই। কর্তৃত্ব অনুভব করার অর্থ কি? করিতে পারি, অর্থাৎ আমার করিবার শক্তি আছে, এরূপ অনুভব করা।

"আমি করিব" এই কথা যখন বলিলাম, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি। "আমি করিব, এই বাক্যটীব অর্থ কি? আমার শক্তিকে কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিব। "আমি করিতেছি" ইহার অর্থ কি? আমার শক্তিকে কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিতেছি। করিব বা করিতেছি ইত্যাদি শব্দে মনের যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে শক্তির অনুভূতি সুস্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার শক্তি অনুভব না করিলে কেহ বলিতে পারে না 'করিব' বা 'করিতেছি।'

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয় সম্বন্ধেই আমাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। ইচ্ছামাত্রে শারীরিক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালন করিতেছি। হাত উঠুক, হাত উঠিল; পা চলুক, পা চলিল; নয়ন ফিরাই, নয়ন ফিরিল। আবাব শরীরের সাহায্যে বহির্জগতের অন্যান্য পদার্থকেও পরিচালনা করিতেছি। তবে এই শক্তির অবশ্য সীমা আছে।

অন্তর্জগতে মানসিক ভাব সকলের উপর আমাদের কর্তৃত্ব-

শক্তি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। এটা ভাবিব না, ওটা ভাবিব; এ দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিব না, এ ইচ্ছাকে দমন করিব; এই প্রকার প্রতিজ্ঞায় আমরা আমাদের কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকি। কেবল প্রতিজ্ঞা নহে; আমরা কার্য্যতঃ অন্তর্জগতের ঘটনানিচয়কে পরিচালিত করিতেছি। ভাঙ্গিতেছি, গড়িতেছি, রাখিতেছি, তাড়াইয়া দিতেছি; মানসিক ভাব সকলের উপর আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছি।

মনে করিলাম, একটা বৃক্ষ হোক্। অমনি বৃক্ষ হইল। বৃক্ষকে শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে সুশোভিত করিলাম; অমনি সুশোভিত হইল। তারপর বৃক্ষের কতক্‌গুলি পত্র ও পুষ্প ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; কতক্‌গুলি ফল পাড়িয়া ফেলিলাম; গোটাকতক্ ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। অবশেষে, সমগ্র বৃক্ষটীকেই বিলুপ্ত করিরা দিলাম।

বলিলাম একটা পর্ব্বত হোক্। অমনি একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইল। পর্ব্বতের শিখরদেশ শুভ্র তুষারে মণ্ডিত করিলাম; কক্ষদেশ নিবিড় তরুলতার হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত করিলাম; রৌপ্যতন্ত্রীসন্নিভ সঙ্কীর্ণ নদী স্রোত সকল উহার বিশালদেহ হইতে প্রবাহিত করিয়া দিলাম। আবার পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, উৎস-মুখ নিরুদ্ধ করিয়া প্রবাহিত নদী সকলকে শুষ্ক করিয়া দিলাম, এইরূপে ক্রমে সমগ্র পর্ব্বতটাকেই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলাম।

মানসিক ভাবসম্বন্ধে মনুষ্যের কর্তৃত্ব বুঝাইবার জন্যই আমরা কল্পিত বৃক্ষ ও পর্ব্বতের দৃষ্টান্ত দিলাম। কেবল বৃক্ষ ও

পর্ব্বত কেন? মানুষ মনে করিলে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, রাখিতে পারে, বিনাশ করিতে পারে।

এই সকল কল্পিত ভাবের সহিত আমাদের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধটী এই;—ঐ সকল ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তা ও কৃত, রক্ষক ও রক্ষিত, বিনাশকারী ও বিনষ্ট, আমাদের সঙ্গে এবং ঐ সকল কল্পিত ভাবের সঙ্গে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ। জড় জগতের পদার্থ বা ঘটনা সকলের মধ্যে এ প্রকার সম্বন্ধ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

মানবাত্মার মধ্যে এই কয়টী গুণ দেখিতে পাওয়া যায়;— জ্ঞান, ভাব, বাসনা, ও কর্ত্তৃত্ব। যে গুণদ্বারা আত্মা সত্যকে জানে, তাহার নাম জ্ঞান (Knowledge); যে গুণদ্বারা আত্মা ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিৎ, ন্যায় অন্যায প্রভৃতি অনুভব করে, তাহার নাম ভাব (Feeling); যে গুণদ্বারা আত্মা কিছু পাইতে বা ভোগ করিতে চায়, তাহার নাম বাসনা (Desires); আবার যে গুণদ্বারা আত্মা আন্তরিক বা বাহ্যিক কোন প্রকার কার্য্য করে, তাহার নাম কর্ত্তৃত্ব (will); এই শেষোক্ত গুণটীই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। মানবাত্মা যে অবস্থায় কার্য্যোন্মুখ ও পরিবর্ত্তন উৎপাদক, সে অবস্থাকেই কর্ত্তৃত্ব বলিতেছি। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার শক্তি একই কথা। কর্ত্তৃত্ব আছে শক্তি নাই; অথবা শক্তি আছে, কর্ত্তৃত্ব নাই; এ দুয়ের কোনটাই আমরা ভাবিতে পারি না। বাস্তবিক এ দুই এক।

কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন কি কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে ? আমি কাজ করিতেছি ; তবে আমি জানি যে, আমি কাজ করিতেছি। আমি জানি না যে, আমি কাজ করিতেছি ; অথচ আমি কাজ করিতেছি ; ইহা কি সম্ভব ? কখনই না। আমি জানিতে পারিলাম না, অথচ আমাদ্বারা একটা কাজ হইয়া গেল, ইহা কি আমরা মনেও করিতে পারি ? আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনদ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না ; কেন না, আমি আমার মনদ্বারাই জানি। আমার মন যদি না জানিতে পারিল, তাহা হইলে উহা আমার মনের কাজ হইল না , সুতরাং আমার কাজ হইল না। আবার, আমার অজ্ঞাতসারে আমার শরীরের দ্বারা কোন কাজ হইলেও উহা আমার কাজ হইল না, উহা আমার বাহিরের কাজ হইল। যাহা আমার ইচ্ছাশক্তি হইতে উৎপন্ন, তাহাই আমার কার্য্য। সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন কখন কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি থাকিতে পারে না।

শক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার একবার পুনরাবৃত্তি করা যাউক। প্রথমতঃ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস কখনই ভ্রমমূলক হইতে পারে না। ভ্রমেরও কারণ থাকে। রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সর্পের জ্ঞান না থাকিলে উক্ত ভ্রম হইতে পারে না। শক্তি যখন ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, না, তখন শক্তির জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে ? বিশেষতঃ শক্তির সত্তাতে বিশ্বাস স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী, ও সর্ব্বজনীন ; এ প্রকার

বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিলে, কোন সত্যই দাঁড়াইবার স্থান পায় না।*

দ্বিতীয়তঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, তাহা জড়ীয় গুণ নহে; শক্তি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, সুতরাং শক্তি জড়ীয় গুণ নহে। তৃতীয়তঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শক্তি আত্মার গুণ; কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আন্তরিক অবস্থা †। চতুর্থতঃ ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানভিন্ন শক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্ভব নহে।

এই চারিটী সিদ্ধান্ত হইতে একটী পঞ্চম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী;—এক জ্ঞানময়ী শক্তি জড়জগতে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। শক্তি যখন জড়ীয গুণ নহে,—আত্মার গুণ; জ্ঞান হইতে যখন উহা অভিন্ন, তখন ইহা বলিতেই

* শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস পরিহার করা এমনি কঠিন যে, অজ্ঞেয়তাবাদী-গণও উহার সত্ত্বা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহাদের নেতা ও শিরোভূষণ স্পেন্‌সর্ বিশ্বব্যাপিনী শক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

—"But amid the mysteries which become the more mysterious, the more they are thought about, there will remain the one absolute certainty that he (man) is ever in the presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

† বহির্জ্জগতে শক্তি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; আত্মশক্তি হইতেই শক্তির জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে, এ কথা হার্ব র্ট স্পেন্‌সর্ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন;—

"The force by which we ourselves produce changes, and which serves to symbolize the cause of changes in general, is the final disclosure of analysis."

FIRST PRINCIPLES.

হইবে যে, যেখানে শক্তি বর্ত্তমান, সেখানে জ্ঞানও বর্ত্তমান ;—জ্ঞানময়ী শক্তি অনন্ত ভুবন পবিচালিত করিতেছে। অন্ধশক্তি অর্থশূন্য বাক্য। ত্রিকোণবৃত্ত এবং অন্ধশক্তি উভয়ই সমান কথা। দয়া, প্রেম প্রভৃতি যেমন আত্মার গুণ, শক্তিও সেই-রূপ আত্মার গুণ। দয়া, প্রেম প্রভৃতি যেমন জ্ঞান হইতে অভিন্ন, শক্তিও সেইরূপ জ্ঞান হইতে অভিন্ন। সুতবাং যেখানে শক্তি আছে বলিয়া মনে করিব, সেখানে উহা জ্ঞানের সহ-যোগে স্থিতি করিতেছে, এরূপ মনে কবিতেই হইবে। এই যে সুবিশাল জড়জগৎ, ইহার সর্ব্বত্র শক্তি কার্য্য কবিতেছে; সুতরাং ইঁহাও বলিতে হইবে যে, ইহাব সর্ব্বত্র জ্ঞান বর্ত্তমান রহিযাছে। ধর্ম্ম যে সত্যধামেব কথা চিবদিন বলিযা আসিতে-ছেন, বিশুদ্ধ যুক্তির অচ্ছেদ্য সূত্র ধবিয়া আমরা সেইখানেই উপনীত হইলাম।

এক জ্ঞানময়ী শক্তি অনন্ত ভুবনে কার্য্য কবিতেছে। বিশ্ব-কার্য্যে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বভাব-সিদ্ধ; সুতরাং কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল স্থলেই শক্তির সত্ত্বা এক মূল সত্য বলিয়া পরিগণিত।* জ্ঞান ও ইচ্ছা হইতে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতবাং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ইচ্ছা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

* আত্ম শক্তি হইতেই যে শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্লেটো হইতে মার্টিনো পর্য্যন্ত অনেক ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। মায়াবাদী বরুক্লি এই সত্যটী অতি পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বহু দেববাদ খণ্ডন।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, জগতের যেখানে শক্তি, সেইখানেই জ্ঞান ও ইচ্ছা বর্ত্তমান, বলিলে কি ভৌতিক উপাসনা ও সর্ব্বপ্রকার জড়োপাসনা সমর্থন করা হয় না? বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, তারা, সূর্য্য সকল পদার্থেই জ্ঞানময়ী শক্তি বর্ত্তমান, বলিলে কি বৈদিক সময়ের আর্য্যগণের ন্যায় সর্ব্বভূতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা প্রতিষ্ঠিত করা হয় না? বাস্তবিক মনুষ্য আদিম অবস্থায়, প্রকৃতির অন্তর্গত

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হর্শেল ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। স্পেন্সরও একথা স্বীকার করেন। "দেবীভাগবত" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও এই দার্শনিক তত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আত্মশক্তি হইতেই যে বিশ্বব্যাপিনী জ্ঞানময়ী শক্তিতে উপনীত হওয়া যায়, জ্ঞানী মার্টিনো ইহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"It is true, that of the reciprocal propositions, "We push against the wind," "the wind pushes against us," we know the force named in the first with a closeness not belonging to our knowledge of the other. We cannot identify ourselves with the wind as our own *nisus* is identified with us. We go out on an energy: We return home on a thought. But that thought is only the reflex of the energy; it has, and can have no other type. Our whole idea of *Power*, is identical with that of *will* or reduced from it. That which, in virtue of the principle of causality, we recognize as immanent in nature, is homogeneous with the agency of which we are conscious in ourselves. Dynamic conceptions have either

উপকারী ও প্রভাবশালী সমুদয় পদার্থেই দেবত্ব আরোপ করিয়া থাকে। পবন দেবতা, বরুণ দেবতা, অগ্নি দেবতা, চন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা প্রভৃতি এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বভূতে জ্ঞানময়ী শক্তি বর্ত্তমান বলিলে কি সেই আদিম ভৌতিক দেবতাগণকে পুনর্জ্জীবিত করা হয় না ?

এ প্রকার আপত্তির কোন কারণ নাই। যদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থে অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আদিম ভৌতিক উপাসনা পুনরুদ্দীপিত করা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান কি বলিতেছে ?

বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া* বলিয়া দিতেছে যে, এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করিতেছে ; স্বতন্ত্র শক্তি কোথাও নাই। পর্ব্বতে কি ভূগর্ভে ; নদীতে কি

this meaning, or no meaning. Cancel this, and you cut them at the root, and they wither into words ; and your knowledge cast out into dry places, has to take refuge again with co-existences and succession. Whatever authority attaches to the law of causality at all, attaches to it, presumably at least, in its intuitive form.—Phenomena are the expression of living energy, and cannot be reduced within narrower limits, unless by express disproof of coincidence between its natural range and its real range. Till that disproof is furnished, the ONE POWER stands as the UNIVERSAL WILL." *Modern Materialism:* by James Martineau LL. D., D. D., Principal, Manchester College.

* Co-relation of forces.

সমুদ্রে; মরুভূমিতে কি শস্তক্ষেত্রে; নগরে কি জঙ্গলে; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই শক্তি। যে শক্তি আমার পদতলশায়ী বালুকা-রাশিতে, সেই শক্তিই কোটি কোটি যোজন দুরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জে বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই শক্তি এক; দুই শক্তি কোথাও নাই। সুতরাং আমাদের যুক্তিতে শত শত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুনর্জ্জীবনে আশঙ্কা নাই। জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একমাত্র।

এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি,—“আদ্যাশক্তি ভগবতী,” জগতের প্রাণরূপে “জলস্থলশূন্যে সমানভাবে” বিরাজমান। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমভাবে দেখিতেছেন;—ইনি ত্রিনেত্রা। দশদিক্ রক্ষা করিতেছেন,—ইনি দশভূজা। ইনি চিরদিন জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে, দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে সবলতা, কদর্য্যতার পরি-বর্ত্তে সৌন্দর্য্য, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি চাতুর্য্য, দুর্নীতির পরিবর্ত্তে সুনীতি আনয়ন করিয়া সংসারকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে ধাবিত করিতেছেন, ইনি চিরদিন মহাপ্রভাবে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন;—ইনি সিংহবাহিনী, অসুর-নাশিনী। ইনি জ্ঞানদাত্রী, ধনদাত্রী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী;—ইনি স্বয়ংই সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক ও গণপতি।

এই নিখিল ভুবনব্যাপিনী, অসীম অনন্তরূপিনী, রূপ-বিবর্জ্জিতা, সর্ব্বরূপ প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা, দশভূজা, অসুর নাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মহাদেবীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা॥

বিশ্বের প্রাণরূপা বিশ্বব্যাপিনী এই মহাশক্তিকে যে ব্যক্তি মৃত্তিকা তৃণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ করিতে ও তথা হইতে বিসর্জ্জন করিতে চায়, তাহার কি মহাভ্রম। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা," প্রতিমার সম্মুখে, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পুরোহিত যখন এই মহাবাক্য আবৃত্তি করেন, বুঝেন না তিনি কি বলিতেছেন? যে দিন হিন্দুসমাজ এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেইদিন চিরদিনের জন্য হিন্দুহৃদয় হইতে পৌত্তলিকতা দূরে পলায়ন করিবে। অনন্ত শক্তিকে যে পরিমিত স্থানে বদ্ধ করিতে চায়, সে অন্ধ; কিন্তু যে আবার অনন্ত শক্তিকে অন্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার তুল্য অন্ধ আর কেহই নাই।

পরমেশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ।

বাইবেল গ্রন্থে আছে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক রসিকতাপ্রিয় সন্দেহবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদী বিদ্রূপ করিয়া বলেন, পরমেশ্বর আপনার প্রতিকৃতিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন নাই; মনুষ্য

কল্পনা করিব। প্রথম ঘড়ি পৌত্তলিক; দ্বিতীয়টা একেশ্বর-বাদী, এবং তৃতীয়টা অজ্ঞেয়তাবাদী।

পৌত্তলিক ঘড়ি বলিল;—"আমাদের যিনি স্বষ্টিকর্ত্তা, তিনি একটা বড় ঘড়ি; আমাদের যেমন স্প্রিং চক্র প্রভৃতি আছে, তাঁহারও সেইরূপ আছে; আমরা যেমন সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন; আমরা যেমন দুইটা কাঁটা দ্বারা সময় ঠিক্ করিয়া দি, তিনিও সেইরূপ করেন।"

একেশ্বরবাদী ঘড়ি একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল;—"এরূপ বলা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদের যিনি নির্ম্মাতা তিনি আমাদেরই মত ঘড়ি, এইরূপ স্প্রিং প্রভৃতি বিশিষ্ট, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। তবে যখন দেখিতেছি যে, আমাদের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথা বলিতেই হইবে যে, আমাদের নির্ম্মাতার জ্ঞান আছে; কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়; নির্ম্মাতা অবশ্য জ্ঞান-বিশিষ্ট।"

অজ্ঞেয়তাবাদী ঘড়ি বলিল,—"ইহা অতি অযুক্ত ও অসার কথা। আমাদের মধ্যে কৌশল আছে বলিয়া আমাদের স্বষ্টিকর্ত্তা বুদ্ধি বা জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইহা কথনই প্রতিপন্ন হয় না। না বুঝিয়া না জানিয়া এমন কথা কেন বলিতেছ? আমাদের মধ্যে যে সকল কৌশল রহিয়াছে, উহা বিকাশের নিয়মানুসারে (Evolution) ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। অবশ্য কোন শক্তি হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, কিন্তু সে শক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানি না,—উহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়।"

এস্থলে একটা নাস্তিক ঘড়ি কল্পনা করা যাইতে পারিত। সে বলিত, "নির্ম্মাতা আবার কি? আমাদিগকে কেহ সৃষ্টি বা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? কোন প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতা আছে বলিয়া মনে করা, একটা অমূলক কল্পনা মাত্র। হায়! কবে ঘড়ি জাতি এই মহা ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে!" কিন্তু এস্থলে এরূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই।

এখন দেখুন, ঘড়ির দৃষ্টান্তের সহিত কোন্ মত অধিকতর সংলগ্ন হয়। উপমা কিছুই প্রমাণ করে না; তথাচ কেবল উপমা বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ঘড়ির উপমা, অজ্ঞেয়তাবাদীর মত অপেক্ষা, একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মের (Theist) মতই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করে।

মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না, এই গুরুতর প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণ উপনিষদে ইহার উত্তর দিয়াছেন;—

"নাহংমন্যেসুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেব নোন বেদেতি বেদ চ।"

"আমি যে ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

আমার পরিমিত হৃদয় মনে অনন্তস্বরূপের ধারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সামান্য একটী ঘটিতে কেমন করিয়া

প্রশান্ত মহাসাগর ধরিবে? কিন্তু আপনার হৃদয় মন যতটুকু, অনন্ত পরমেশ্বরের তত্তটুকু ভাব কি ধারণ করিতে পারিব না? ঘটির আয়তন যতটুকু, প্রশান্ত মহাসাগরের ততটুকু জল কি উহাতে ধরিবে না?

শিশু কি জানে তাহার পিতার কত জ্ঞান, কত ক্ষমতা? তথাচ কি সে তাহার পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারে না? তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি হস্ত দিয়া পিতার পদদ্বয় ধরিতে পারে না? জ্ঞানী, ক্ষমতাবান্ পিতার বিষয় ক্ষুদ্র শিশু কিছুই বুঝিতে পারে না; তথাচ "আমার পিতা" বলিয়া তাহার হৃদয়ের ভালবাসা ও আনন্দ কি প্রকাশ করিতে পারে না? হে জগতের পিতামাতা! তুমি অনন্ত অগম্য হইয়াও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া নিরুপম আনন্দ দান করিতেছ! ধন্য তুমি; ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার অনুগ্রহ!

এই ঘোর সংসারারণ্যে আমাদের পথ প্রদর্শক কে? এই মহাসমুদ্রে আমাদের দিক্ দর্শন শলাকা কোথায়? ভগবানের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া আসে? মনুষ্যের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়াই তাঁহার করুণাস্রোত প্রবাহিত হয়। প্রাতঃকালে বাতায়ন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে যেমন সূর্য্যরশ্মি আপনা হইতেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও বিবেকের বাতায়ন খুলিয়া দিলে তন্মধ্যদিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আলোক মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

জ্ঞান যে মনুষ্যের স্বাভাবিক সম্পত্তি; জ্ঞানালোকে যে, আমরা সত্যরত্ন উপার্জ্জন করিতে পারি; তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই,—মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বিবেক আবার কি? জ্ঞান সাধারণ শব্দ—যে কোন প্রকার সত্য হউক, উহা অধিকার করিবার সাধারণ নাম জ্ঞান। বিবেকের কার্য্য বিশেষ কার্য্য। বিবেকের নিকট আমরা উচিত অনুচিত জ্ঞান লাভ করি।

বিবেকের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে দুটি বিষয় দেখা আবশ্যক;—কর্ত্তা ও কার্য্য। অর্থাৎ বিবেক সম্বন্ধে মানবাত্মার অবস্থা ও বিবেক সম্বন্ধে মানবাত্মার কার্য্যের প্রকৃতি। মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে উচিত ও অনুচিত এই দুই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাই। এমন কার্য্য থাকিতে পারে, যাহা উচিত ও অনুচিত এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোনটিরই অন্তর্ভূত নয়। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের এখন কোন সম্বন্ধ নাই।

ঔচিত্যবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধ।

উচিত ও অনুচিতের অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন, যাহা সুখকর, তাহাই উচিত; যাহা দুঃখকর, তাহাই অনুচিত। হার্বার্ট স্পেন্‌সর বলেন, "মানুষ দেখিতেছে যে, যে কার্য্যে সুখোৎপত্তি তাহাই নৈতিক কার্য্য আর যে কার্য্যে দুঃখোৎপত্তি, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। তথাচ মানুষ স্বীকার করিতে চায় না যে, সুখকর হইলেই নৈতিক কার্য্য হয়, এবং দুঃখকর হইলেই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হয়। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, লোকের মন অবৈজ্ঞানিক অবস্থায় রহিয়াছে;—লোকে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারে না।"

কথাটি কি যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? উপকারী বলিয়া জ্ঞান ও নৈতিক (moral) বলিয়া জ্ঞান কি একই প্রকার মানসিক কার্য্য? যাহা নৈতিক, তাহা উপকারী, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই উভয় প্রকার জ্ঞানের একতা স্বীকার করিতে হইবে? উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি অবশ্যম্ভাবী? কখনই না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি; সুন্দর ও হিতকর কি একই পদার্থ? হিতকারীতার জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান যেমন ভিন্ন, হিতকারিতার জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন। মাথাল ফল কেমন সুন্দর! কিন্তু তাই বলিয়া কি মাথাল ফলকে হিতকারী বলিতে হইবে? উহাতে কোন হিতকর গুণ থাকিতে পারে;

Vide Data of Ethics.

কিন্তু উহা সুন্দর বলিয়াই হিতকর, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এরূপ ফল আছে যাহা উপকারী, কিন্তু দেখিতে সুন্দর নহে। উপকারী বলিয়াই যে ঐ প্রকার ফলকে সুন্দর বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও উপকারিতার জ্ঞান যেমন ভিন্ন, নৈতিক জ্ঞান ও উপকারিতার জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন।

সৌন্দর্য্যবোধ যেমন স্বাভাবিক, নৈতিকবোধও সেইরূপ স্বাভাবিক। নৈতিকবোধকে স্বাভাবিক বলিলে অনেক বুদ্ধি-মান তার্কিক আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যে, নৈতিক বোধ যদি স্বাভাবিক হইবে, তবে মনুষ্যের মধ্যে নীতি সম্বন্ধে এত মতভেদ কেন? এক ব্যক্তি নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, আর একজন তাহাই নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার করিতেছে। নৈতিক জ্ঞান স্বাভাবিক হইলে নীতি সম্বন্ধে এ প্রকার মত বিরোধ উপস্থিত হইবে কেন?

কি কি কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিক বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়, এ স্থলে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বুঝিলে যথেষ্ট হইবে যে, কোন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইলেই তাহার স্বাভাবিকত্ব খণ্ডিত হয় না। সৌন্দর্য্য জ্ঞান স্বাভাবিক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য জ্ঞান বিষয়ে কি মানুষের মধ্যে ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না? কোন স্ত্রীলোকের পদতল ছোট না হইলে, চীন দেশী-য়েরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে করেন না। পাছে পা বড় হয়, সেই জন্য চীন দেশীয়া রমণীগণ বাল্যকাল হইতে এক

প্রকার লৌহপাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের পদসম্বন্ধে আমাদেরতো উক্তরূপ সংস্কার নাই। ইংলণ্ডবাসী-দিগের মধ্যে লম্বাগলা ও কটাচক্ষু সুন্দরীর লক্ষণ। লম্বাগলা বা কটাচক্ষু হইলে আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে কি সুন্দরী বলিয়া মনে করি?

উচিত' ও 'সুখকর' কি অভিন্ন?

সুখকর ও উচিত কি একার্থবোধক শব্দ? "যাহা সুখকর তাহাই উচিত" এ বাক্যের অর্থ কি? সুখকর ও উচিত এই দুই শব্দের একই তাৎপর্য্য হইলে, "যাহা সুখকর তাহাই উচিত" এ বাক্যের অর্থ কি "যাহা সুখকর তাহাই সুখকর" হয় না? সেইরূপ যদি 'দুঃখকর' ও 'অনুচিত' একার্থবোধক শব্দ হয়, তাহা হইলে "যাহা দুঃখকর, তাহাই অনুচিত'' এ বাক্যের অর্থ কি যাহা "দুঃখকর তাহাই দুঃখকর'' হয় না?

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'সুখকর' ও 'উচিত' এবং 'দুঃখকর' ও 'অনুচিত' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ। নতুবা যখন সুখবাদী ও হিতবাদীরা বলেন."যাহা সুখকর, তাহাই উচিত'' তখন সে কথার কোন অর্থই থাকে না;—যাহা ''সুখকর তাহাই সুখকর'' হইয়া যায।

যে চায় সে পায় না।

সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না;—কেহ কখন পারে নাই। সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যে ব্যক্তি অটলভাবে কর্ত্তব্য পথে চলিতে থাকে, সেই যথার্থ সুখের অধিকারী। কিসে একটু সুখ হইবে, কিসে

একটু সুখ হইবে, বলিয়া যাহারা দিবা রাত্র লালায়িত, তাহারা কখনই প্রকৃত সুখের পথ দেখিতে পায় না। আর যে সুখও চায় না, দুঃখও চায় না—সত্য চায়, ধর্ম্ম চায়, কর্ত্তব্য সাধন চায়,—তাহারই সহিত সুখের সাক্ষাৎকার হয়। যে চায় সে পায় না, যে চায় না সেই পায়, এ রাজ্যের এই আইন।

সুখই যদি জীবনের উদ্দেশ্য, সুখই যদি আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের লক্ষ্য, তবে সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সুখী হওয়া যাইবে না কেন? লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়! সুখই কার্য্যের লক্ষ্য, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যাহা সত্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুখী হইতে পারিবে না কেন? সত্য কি সুখের বিরোধী? মিল তাঁহার আত্মচরিতে (Autobiography) স্বীকার করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি সুখের জন্য লালায়িত, সে কখন সুখ পায় না; যে ব্যক্তি সুখকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়, সেই সুখ পায়।"

উচিত ও অনুচিতের অর্থ।

উচিত ও অনুচিতের প্রকৃত অর্থ কি? যে কার্য্য করিতে বা না করিতে মনুষ্য বাধ্য, তাহাই উচিত বা অনুচিত। বাধ্যতা বোধ উচিত ও অনুচিত জ্ঞানের মূলে স্থিতি করিতেছে।

বাধ্যতা বোধ (sense of obligation) কোথা হইতে আসে? "এই কার্য্যটি করিতে আমি বাধ্য, না করিলে আমি অপরাধী" এই ভাবটী মনুষ্যের মনে কোথা হইতে আসে? রাত্রি দুই প্রহরের সময়, বিনা সাক্ষী, বিনা দলিল, এক

ব্যক্তি অন্ধকার ঘরে তোমার হস্তে দশ হাজার টাকা দিয়া বলিল, "আমি দূরদেশে চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া আপনার নিকট হইতে এই টাকা পুনর্গ্রহণ করিব।" তুমি কিছু দিন পরে সংবাদ পাইলে যে, বিদেশে গিয়া সে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। এখন তুমি কি করিবে? তাহার গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিবে, না মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের নিকট সেই টাকা পাঠাইয়া দিবে? তোমার স্বার্থবুদ্ধি বলিতে পারে, "কেহ তো জানে না যে, তোমার কাছে সে ব্যক্তি টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। তুমি অক্লেশে উহা নিজে ভোগ কর।" কিন্তু তোমার ভিতরে এমন আর কিছু আছে, যাহা গম্ভীরস্বরে এই ঘৃণিত কথার প্রতিবাদ করিবে। "ছি! ছি! এমন কাজ করিও না। লোকে জানুক্ আর নাই জানুক্, সাক্ষী বা দলিল থাকুক্ আর নাই থাকুক্, যাহার টাকা, তাহার স্ত্রী পুত্রকে দেও; বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।"

এই বাধ্যতা বোধ কি বুদ্ধি (Intellect) হইতে উৎপন্ন হয়? বুদ্ধি কখন বাধ্যতা বোধ দিতে পারে না। অভিজ্ঞতা কখন বাধ্যতা বোধ দিতে পারে না।

চিকিৎসা করাইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে; বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এ কথা বলিয়া দেয়। কিন্তু রোগীকে চিকিৎসা করা যে উচিত, তাহা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা কোন কালেই বলিয়া দিতে পারে না। বুদ্ধি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করে। কোন্ কার্য্যের কি ফল, অভিজ্ঞতা ইহাই জানিতে পারে। রোগের চিকিৎসা করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এই পর্য্যন্ত বলিয়া

দিতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা করা যে কর্ত্তব্য, চিকিৎসা করিতে যে আমাদের নৈতিক বাধ্যতা আছে, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তাহা বলিতে পারে না।

ঘটনা বা পদার্থ সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা, একটী হইতে আর একটী সিদ্ধান্ত করা, তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করা, বুদ্ধির কার্য্য। নৈতিক বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? বিষ ভক্ষণ করিলে প্রাণ যায়, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু বিষ ভক্ষণে প্রাণ বিনাশ করা যে অনুচিত ইহা কে বলিল? দুঃখীকে দান করিলে দুঃখদূর হয়, বুদ্ধি ইহা বলিয়া দেয়। কিন্তু দুঃখীকে দান করা যে কর্ত্তব্য, ইহা কে বলিয়া দিল?

তুমি পথ দিয়া যাইতে যাইতে দূরে দেখিলে যে, দুইজন লোক একটী ছেলেকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে, আর একজন তাহার উরুদেশে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে। তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছেলেটিকে মুক্ত করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী হইলে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলে যে, যে দুইজন ছেলেটিকে ধরিয়া আছে, তাহারা একজন ছেলের পিতা, আর একজন ছেলের পিতৃব্য। আর যে ব্যক্তি ছেলের উরুদেশে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, সে একজন ডাক্তর;—ছেলের উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে, তজ্জন্য অস্ত্র-চিকিৎসা হইতেছে।

এই কথাটী শুনিবামাত্র তোমার সব রাগ জল হইয়া গেল। তাহাদিগকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, তাহারা যে অত্যন্ত ভাল কাজ করিতেছে, তোমাকে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে হইল।

কেনই বা তুমি প্রথমে রাগ করিয়াছিলে, এবং কেনই বা পরে সন্তুষ্ট হইলে? যদি একটী সুন্দর ছবির অর্দ্ধাংশ হস্ত-দ্বারা ঢাকিয়া অপরাদ্ধ কোন লোকের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে, সে কি তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে? কখ-নই না। পারে না কেন? ছবিটীর প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ-জনিত সৌন্দর্য্য সে দেখিতে পায় না। কিন্তু হাতখানি যদি একবার তুলিয়া লও, তৎক্ষণাৎ সে আহা! আহা! করিয়া উঠিবে। ছবিটীর, প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ-জনিত শোভা অনুভব করিয়া মোহিত হইয়া যাইবে!

ছবির বিষয়ে যেমন, ঐ ছেলেটীর বিষয়েও সেইরূপ। তুমি প্রথমে ভাবিয়াছিলে যে, কয়েকজন নির্দ্দয় লোক একটী নির্দ্দোষী শিশুকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে, তখন ছবির একদিক দেখিয়াছিলে,—কিন্তু যখন জানিতে পারিলে যে, শিশুর পিতা, পিতৃব্য ও তাঁহাদের আনীত ডাক্তর তাহাকে রোগমুক্ত করি-বার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তুমি ছবির সকল অংশ দেখিতে পাইলে।

এস্থলে বুদ্ধি ও বিবেকের কার্য্যের পার্থক্য বুঝা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধি একটী ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। বুদ্ধি যাহা বলিল, বিবেক তাহা অন্যায় বলিয়া দিল। পরে আবার বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধি যখন আপনার ভ্রম সংশোধন করিয়া প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিল, তখন আবার বিবেক তাহাকে উচিত কার্য্য বলিয়া মত প্রকাশ করিল।

কোন্ কার্য্যের কি ফল, তাহা নির্দ্ধারণ করা বুদ্ধির কার্য্য;

সুতরাং কার্য্যের সকল দিক্ দেখিতে না পাইলে ফলাফল সম্বন্ধে বুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বুদ্ধি ফলাফল বলিয়া দেয় ; বিবেক উচিত অনুচিত বলিয়া দেয়। শিশুর উরুদেশে অস্ত্র-চালনা করিলে তাহার যন্ত্রণা হয়। স্ফোটকাদি হইলে অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার আরোগ্য লাভ হইতে পারে। বুদ্ধি ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারে না, কিন্তু অনর্থক অস্ত্র-বিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেওয়া যে অনুচিত, এবং রোগমুক্ত করিবার জন্য অস্ত্র-চিকিৎসা করা যে উচিত কার্য্য, ইহা কেবল বিবেকের বাণী ; বুদ্ধি এবিষয়ে অন্ধ।

নৈতিক-বিষয়ে মতভেদ কেন হয় ?

এস্থলে আনুষঙ্গিকরূপে একটী কথা বলিব। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তটীতে বুঝা যাইতেছে যে, আংশিক দৃষ্টি নৈতিক-বিষয়ে মতভেদের প্রধান কারণ। এক ব্যক্তি কোন কার্য্যের একটী অংশ দেখিতেছে, আর এক ব্যক্তি সেই কার্য্যের অন্য অংশ দেখিতেছে ; এস্থলে উভয়েই আংশিক, উভয়েই বিভিন্ন ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। কিন্তু যিনি কার্য্যটীকে সমগ্রভাবে বিচার করিবেন, তিনিই উহার প্রকৃত-স্বরূপ অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

নৈতিক-বিষয়ে মতভেদের আর একটী গুরুতর কারণ নৈতিক অবনতি। চক্ষুর দোষ জন্মিলে যেমন মনুষ্যের মধ্যে দর্শন বিষয়ে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়ও স্বাভাবিক নৈতিক-বুদ্ধি বিকৃত হইলে নৈতিক-বিষয়ে বিভি-

ন্নতা লক্ষিত হয়। নৈতিক মতভেদের এই দুইটী প্রধান কারণ।

সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান।

অনেক প্রখর-বুদ্ধি তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য সকল কার্য্যই সুখের জন্য করিয়া থাকে। আহার পান হইতে জ্ঞান-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মানুষ সুখের জন্য করিয়া থাকে। সুখ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। বিবেক আবার কি ?

যাঁহারা সুখেচ্ছাকে মানুষের সকল কার্য্যের একমাত্র উৎস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিবেকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা যাহাকে কর্ত্তব্য-জ্ঞান বলি তাহা কি সুখেচ্ছা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ? নীচ কি উচ্চ, অধর্ম্ম কি ধর্ম্ম, মনুষ্য সকল কার্য্যই যদি সুখেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সম্পন্ন করে, এমন হয়, তাহা হইলে সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে কি একই পদার্থ বলিতে হইবে ? সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইলে, পেটুক, চোর, ও লম্পটের কর্ত্তব্য-জ্ঞান তো যারপরনাই উজ্জ্বল বলিতে হইবে !

সুখলাভই যদি আমাদের সকল কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যে সকল স্থলে কোন সদনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ করা দূরে থাকুক, দুঃখভোগ করিবারই সম্ভাবনা, সে সকল স্থলে আমরা সদনুষ্ঠান করিতে বাধ্য কেন ? যদি এমন সময় উপস্থিত হয় যে, আমার প্রাণ দিলে দেশের মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সকল সুখের মূল যে 'জীবন তাহা' দেশের জন্য বিসর্জ্জন দিব কেন ?

এ কথার উত্তরে তার্কিক মহাশয়গণ বলিতে পারেন যে, সেই দেহ বিসর্জ্জনে তুমি এত সুখ পাইবে যে, তৎপরিবর্ত্তে শতবর্ষ জীবিত থাকিলেও তুমি তেমন সুখ পাইবে না ;—সেই মুহূর্ত্ত কালের সুখ, সমস্ত জীবনব্যাপী সুখের অপেক্ষা পরিমাণে অনেক অধিক।

কিন্তু এ কথায় কিছুই উত্তর হইল না। যে ব্যক্তি মরণেই পরম সুখ প্রত্যাশা করিতেছে, সেতো সুখের লোভে মরিবে। কিন্তু যে তাহাতে সুখ বোধ করিবে না, সে দেশের জন্য মরিবে কেন ?

আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যে মরণে সুখের আশা করে সে মরিবে, আর যে করে না, সে মরিবে না ; সুতরাং ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই রহিল না। অর্থাৎ দেশের জন্য যে মরিতেছে সে মরিতেছে কেন ? কর্ত্তব্য বলিয়া নয়, সুখের লোভে আর যে মরিল না, তাহার কোন কর্ত্তব্য লঙ্ঘন হইল না ; কেবল সুখের প্রত্যাশা নাই বলিয়া সে এমন কাজ করিল না। উভয় স্থলেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সহিত কোন সংস্রব নাই। একবাজি দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওয়া, পোলাও খাওরা, আর দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করা একই শ্রেণীর কার্য্য। পোলাও খাওয়া ও দেশের জন্য প্রাণ দেও-য়াতে তফাৎ কোথায় ? উভয় কার্য্যেরই লক্ষ্য সুখ।

বাস্তবিক কথা এই যে, কোনটাই নৈতিক কার্য্য (Moral action) হইল না। একটা কাজে নিকৃষ্ট বা অল্পসুখ, আর একটায় প্রকৃষ্ট বা অধিকসুখ বলিলেও হইবে না। নৈতিক-জ্ঞান বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ব্যতীত কখন নৈতিক কার্য্য হয় না।

সকল কার্য্যের অভিসন্ধি সুখ হইলে, সকল কার্য্যই এক শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া যায় ;--নৈতিক-কার্য্য বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার কার্য্য থাকে না।

বিবেক ও হিতবাদ।

যাহাতে আপনার সুখ, তাহাই নৈতিক কার্য্য, ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, যে কার্য্যে অধিকাংশ লোকের সুখ হইবে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নৈতিক-কার্য্য। অথবা এরূপ বলিলেও হয় যে, যে কার্য্যের গতি (Tendency) অধিকাংশ লোকের মঙ্গলের দিকে, তাহাই নৈতিক-কার্য্য।

কিন্তু এই মতটি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাস্য এই যে, যে কার্য্যে অধিকাংশ লোকের সুখ, তাহা করিতে আমরা বাধ্য কেন ? স্বার্থমূলক নীতিবাদ সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছি, হিতবাদ (utilitarianism) সম্বন্ধেও সেইরূপ বলি যে, যদি অধিকাংশ লোকের হিতের জন্য আমার জীবনদান করা আবশ্যক হয়, তবে আমি তাহা করিতে বাধ্য কেন ? সকল সুখের মূল যে জীবন, তাহা অন্যের জন্য বিসর্জ্জন দিব কেন ?

এ কথার উত্তর এই যে, ভাব (feeling) হইলেই মানুষ তদনুরূপ কার্য্য করে। যদি পরের জন্য প্রাণ দিবার উপযুক্ত ভাব তোমার হয়, তুমি প্রাণ দিতে পারিবে, নতুবা পারিবে না। মানুষ ভাবের অধীন হইয়া কার্য্য করে ; ভাব চরিতার্থ হইলে সুখানুভব করে।

এটি একটী উত্তর বটে, কিন্তু সদুত্তর নহে। ভাব হইলেই

লোকে কাজ করিয়া থাকে, সত্য; কিন্তু সকল ভাবকেই কি কার্য্যে পরিণত করা বিধেয়? উহাতে কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই? পরহিতৈষণার ভাব প্রবল হইলে মানুষ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, উপযুক্ত ভাব হইলে পরহিতে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান করিতে পারে;—ইহাতে কথার মীমাংসা হইল না;—কথা এই যে পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিতে আমরা বাধ্য কেন? যাহাতে অধিকাংশের সুখ, তাহাতে যদি আমার সুখ না হয়, তবে আমি তাহা করিব কেন? ভাব হইলে করিব, না হইলে করিব না; আর খুসি হয় তো করিব, খুসি না হয় করিব না, এ উভয়ই এক কথা।

কিন্তু যাহা আমার খুসির উপর নির্ভর করে, তাহাই কি নৈতিক কার্য্য? দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওয়া, পোলাও খাওয়া, নৈতিক কার্য্য নয় কেন?

যে কার্য্যে জগতের মঙ্গল, তাহাই করিব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যাহাতে জগতের মঙ্গল তাহাতেই আমার নিজের মঙ্গল, আমি মনুষ্যসমাজের এক জন, সুতরাং সকলের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল।

যাঁহারা এরূপ উত্তর করেন, তাঁহারা হিতবাদের মত (Utilitarianism) সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থমূলক নীতি-বাদের (Selfish theory of morals) শরণাপন্ন হন। স্বার্থমূলক নীতিবাদের দোষ প্রদর্শন করিলে, হিতবাদের কথা বলেন, এবং হিতবাদের ভিত্তিমূল দেখাইতে বলিলে, স্বার্থমূলক মতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিক্ টানিতে ওদিক্ যায়, ওদিক্ টানিতে এদিক্ যায়; দুই দিক্ বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(১) যে কার্য্যে অধিকাংশ লোকের সুখ, তাহাই উচিত।

(২) যে কার্য্যে অধিকাংশের সুখ তাহা উচিত কেন?

(৩) কেন না, তাহাতে অধিকাংশ লোকের সুখ। "পুনর্ম্মূষিকোভব।" যে মূষিক সেই বিড়াল, যে বিড়াল, সেই মূষিক।

আসল কথা এই যে, নৈতিক কার্য্যের মূলে যে বাধ্যতা-বোধ, বা দায়িত্ব বোধ বা কর্ত্তব্যজ্ঞান, (যে কোন শব্দেই কেন ভাবটী প্রকাশ কর না), উহা কোথা হইতে আসিল? হিতবাদ দর্শন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। বাধ্যতাবোধকে (Sense of obligation) মানব হৃদয়নিহিত স্বাভাবিক ভাব, মনুষ্যের একটী নৈতিক সহজজ্ঞান (Moral intuition) না বলিলে আর পথ নাই।

অন্যের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে আমি বাধ্য কেন?

কোন নির্জ্জন স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা কুড়াইয়া পাই-লাম। তখন আমি কি করিব? যাহার টাকা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া উহা সমর্পণ করিব, না, সে গুলি আত্মসাৎ করিব? আমি নিতান্ত গরিব; আমার স্ত্রী পুত্র অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে; আমি কেন টাকাগুলি লইয়া চিরদিনের জন্য আমার দরিদ্রতা দূর করি না? ধনের প্রকৃত অধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্তে ধন দিতে আমি বাধ্য কেন? এই প্রকার ব্যবহারে জনসমাজের মঙ্গল হয়, সেই জন্য উহা করিতে বাধ্য? আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসমাজের মঙ্গলের জন্য

কার্য্য করিতে আমি বাধ্য কেন? হিতবাদ এ প্রশ্নে নিরুত্তর। কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কে বলিতেছে, "না, এমন মহাপাপ করিও না। সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাও, সেও ভাল, কিন্তু পরস্বাপহরণরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মে পতিত হইও না। যাহার টাকা তাহাকে দেও; দিতে তুমি বাধ্য।" এই বাধ্যতাবোধকে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নৈতিক সংস্কার বলা ভিন্ন অন্য পথ নাই।

বাধ্য করে কে?

বাধ্যতা বলিলেই একজন বাধ্য করিতেছে, আর একজন বাধ্য হইতেছে, বুঝায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাধ্য করে কে? আমি আপনি কি আপনাকে বাধ্য করি? এমন কখনই হইতে পারে না। পারে না কেন? আমার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য-বোধ বিভিন্ন পথে চলে। যে কার্য্য আমার ইচ্ছাপ্রসূত, তাহাই আমার কার্য্য। যাহা আমার ইচ্ছার (will) বিপরীত, তাহা কখন আমার কার্য্য হইতে পারে না। অনেক সময় কি এমন হয় না, যে, আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ঠিক্ তাহার বিপরীত কথা বলে? আমি বলি তাস-ক্রীড়া করিয়া আমোদে সময় ক্ষেপণ করি, কিন্তু আমার ভিতরে কে বলিতেছে, "তোমার অমুক বন্ধু শয্যাগত; রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবা কর।" আমি বলি মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া পরিধান করি; আমার ভিতর হইতে কে বলিতেছে, "তুমি নিজে সামান্য পরিচ্ছদ

ধারণ করিয়া, শতচ্ছিদ্র-বস্ত্রধারী, শীতবাতে-কম্পিত তোমার দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে গাত্রাবরণ প্রদান কর।” আমি বলি, মনের সুখে সুপক্ক পলান্ন ভোজন করি, আমার ভিতর হইতে কে বলিতেছে, “কত নির্ধন ভ্রাতা ভগিনীর শাকান্ন জুটিতেছে না ; তুমি কি বলিয়া সুখ-সেব্য পলান্নে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে ? দুঃখী-দুঃখিনীদের উদরান্নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর।”

এই প্রকাব সর্ব্বদাই কি হয় না ? আমি বলি, দক্ষিণ দিকে যাইব, প্রাণের ভিতর হইতে কে বলে, “উত্তরে যাও।” এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমি কি দুইজন ? আমার মনতো সে কথা কথনই বলে না। আমার মন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, আমি একজন ;—অনেক বিষয়ে আমাব জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ পায় বটে ; কিন্তু আমি এক।

তবে বাধ্য করে কে ? আমি যথন দুই ব্যক্তি নহি, অথবা আমি একাকী আপনি বাধ্য করিতেছি, ও আপনি বাধ্য হইতেছি, ইহাও সম্ভব নহে, তথন আমাকে বাধ্য করে কে ? আমার উপরে ও আমা হইতে ভিন্ন একজন আছেন, যিনি আমার হৃদয়ে এই বাধ্যতাবোধ প্রেরণ করিতেছেন, ইহা না বলিলে প্রশ্নের সদুত্তর হইতে পারে না।

বাধ্যতাবোধ ও সামাজিক ভয়।

কিন্তু এ কথায় সন্দেহ-বাদী তার্কিক কথন সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি বলিবেন, “নৈতিক-বাধ্যতা (Moral obliga-

tion) আবার কি? উহা সামাজিক ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জনৈক জর্ম্মান দেশীয় সন্দেহবাদী পণ্ডিত বলেন যে, লোকে যাহাকে বিবেক বলে, উহা আর কিছুই নহে; এই পাঁচটী পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে :—এক পঞ্চমাংশ লোকভয়; এক পঞ্চমাংশ উপধর্ম্ম; এক পঞ্চমাংশ কুসংস্কার; এক পঞ্চমাংশ যশঃস্পৃহা; আর এক পঞ্চমাংশ দেশাচার। তাঁহার মতে এই কয়টী পদার্থের এই বিশেষ পরিমাণ সংযোগ হইয়া বিবেক নামক মানসিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

অধুনাতন সময়ের কোন কোন উচ্চশ্রেণীর সন্দেহবাদী পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যে মত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

তাঁহারা বলেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক শাস্তিভয় হইতে নৈতিক বাধ্যতাবোধের উৎপত্তি। জনসমাজের সৃষ্টি হইতে দুষ্কর্ম্মের শাসন জন্য শাস্তি প্রচলিত রহিয়াছে। লোকে যখনই দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই তাহার মনে স্বভাবতঃ শাস্তিভয় উপস্থিত হইয়াছে। বংশপরম্পরায় এই শাসনভীতি মানব মনে কার্য্য করাতে, বৈজিক নিয়মানুসারে (Law of heridity) উহা মজ্জাগত বা প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাকে নৈতিকবাধ্যতা, দায়িত্ববোধ, বা কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, উহার মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনভয়। এক সময় যাহা শাসনভয় ছিল, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া মনুষ্য হৃদয়ে বিবেক বা রাজনৈতিক বাধ্যতার আকারে পরিণত হইয়াছে

ভয় ও নৈতিক বাধ্যতা বিপরীত পদার্থ।

এই মতটিকে কি যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি ; যদি ভয় ও নৈতিক বাধ্যতা সমধর্ম্মী পদার্থ হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ভয় ও নৈতিক বাধ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। ভয় যদি মানুষকে দক্ষিণে লইয়া যায়, নৈতিক বাধ্যতা তাহাকে উত্তরে লইয়া যাইবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক ভয় এবং নৈতিক বাধ্যতা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান এতদূর বিরুদ্ধ-প্রকৃতি-সম্পন্ন যে, অনেক সময় একটি ভাব আর একটি ভাবকে বিনাশ করে। যে পরিমাণে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল হয়, সেই পরিমাণে ভয় চলিয়া যায়। প্রকৃত বিবেকী ব্যক্তির হৃদয়ের প্রকৃত ভাব কি? যাহা উচিত তাহা করিব ; কোন কষ্ট, কোন বিপদ, কোন প্রকার লোক ভয় গ্রাহ্য করিব না।

জ্ঞানী সক্রেটিস্ যখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ক্রিটো নামক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিবার অনুরোধ করিলে তিনি যখন বলিলেন, "ক্রিটো! আমি এই সর্ব্বজনাধিগত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোথায় গমন করিব?" তখন কি সেই বিবেকী সক্রেটিস্ রাজনৈতিক বা সামাজিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন?

যখন অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ ক্রুস্‌যন্ত্র, ঈশার পবিত্র দেহে শোণিত ধারা প্রবাহিত করিল, তখন কি তিনি সামাজিক বা রাজ

নৈতিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন? যখন মহাত্মা সেণ্ট পল রোম-নগরস্থ কারাগারে, সিংহ মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন কি তিনি সামান্যজনসুলভ ভয় ভাবনায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন? বীরহৃদয় মার্টিন লুথার, যখন "অভ্রান্ত পোপের" বিরুদ্ধে বজ্রপ্রক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন কি তিনি ভীতি-পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন? স্বদেশপ্রেমী ম্যাট্‌সিনি, মাতৃভূমি ইটালিকে অষ্ট্রিয়ানদিগের দাসত্বনিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য কি ভীতিবিলোড়িত হৃদয়ে নির্ব্বাসন যন্ত্রণা বহন করিয়াছিলেন? ধর্ম্মবীর পার্কার, যখন মার্কিনদেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচাব করিতে, এবং কাফ্রিদাস-দিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তখন কি নীচ লোকভয় তাঁহার বীরত্বের মূলে অবস্থিতি করিয়াছিল? চিরস্মরনীয় গালিলিও যখন আপ-নার বিচাবকদিগের সম্মুখে, রক্ত মাংসের দুর্ব্বলতা বশতঃ স্বীয় আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পৃথিবী-তলে পদাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন, "ইহা এখনও চলিতেছে," তখন কি শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া অথবা ভূগর্ভস্থ যন্ত্রণাপূর্ণ তিমিরময় কারাগৃহে বাস করিবার লোভে এপ্রকার অপ্রত্যাশিত কার্য্য করিয়াছিলেন?

কেবল বিদেশীয় মহাপুরুষদিগের কথা কেন বলিতেছি? পঞ্জাবে নানক, বঙ্গভূমিতে চৈতন্য ও রামমোহন, যে আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কি আর নিমেষের জন্য ভাবিতে পারি যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা

-নৈতিক বাধ্যতা সামাজিক রাজনৈতিক ও ভয়সম্ভূত ভাব-মাত্র? এই সকল মহাত্মারা আপনাদের হৃদয়ের গভীর স্থানে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, জন সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান একান্ত উচিত বলিয়া প্রতীতি করিয়াছিলেন,—অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহারা তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছিলেন,—কোন ভয়,কোন বিপদ, কোন স্বার্থনাশ তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই। যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নানক পঞ্জাবে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে গিয়া কোন প্রকার বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, চৈতন্য শান্তিপুরে ইষ্টক বৃষ্টির মধ্য দিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন, রামমোহন রায় প্রাণ হানির সম্ভাবনা সত্বেও অকুণ্ঠিত চিত্তে উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসন ভয় হইতে তাহার উৎপত্তি, এমন অসম্ভব কথাকে যাঁহারা দার্শ-নিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের চেষ্টাকে ধন্যবাদ!

'মানসেল সাহেব বলেন যে, 'আমরা দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ মনুষ্য সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, পরমেশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ অর্থে ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারেনা। অথচ পরমেশ্বরে দয়াময়, জ্ঞান ময় প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিতে আমরা বাধ্য;—উহা করা আমাদের একান্ত উচিত।

মিল এই কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই

যে, 'আমরা যে অর্থে মনুষ্য সম্বন্ধে দয়া জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কার, সেই অর্থই আমরা বুঝি—উহাই শব্দ গুলির অর্থ। যদি পরমেশ্বর সম্বন্ধে দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে ঐ সকল শব্দ মনুষ্য সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে,—অন্য অর্থ জানি না। পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় বা দয়াময় বলিলে উক্ত উভয় শব্দে যাহা বুঝি তাহাই মনে করিয়া বলিতে পারি, নতুবা বলিতে পারি না; দয়া বলিলে যাহা বুঝি যদি পরমেশ্বরে সেরূপ কোন গুণ না থাকে, তবে তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারি না। না বলার জন্য যদি তিনি আমাকে নরকে পাঠাইয়া দেন, আমি নরকেই যাইব, ("To hell I will go").

ইহা মিলের ন্যায় সত্যপ্রিয় লোকের উপযুক্ত কথাই বটে! কিন্তু সত্যপ্রিয়তা বিষয়ে যাহাই কেন হউক না, যে মত, কর্ত্তব্য জ্ঞানকে ভয় সম্ভূত-ভাব বলিয়া ব্যাখ্যাকরে, সে মত কোথায় রহিল? যে কর্ত্তব্যজ্ঞান সত্য রক্ষার জন্য মানবজাতিকে নরকে পর্য্যন্ত যাইতে বলে তাহাকে কোন্ মুখে ভয়-সম্ভূত ভাব বলিব?

কেবল তাহাই নহে। মিলের হিতবাদ দর্শনইবা কোথায় রহিল? কুমারী কব অতি বিচক্ষণতার সহিত এই কথা বলিয়াছেন। যদি অধিকাংশ লোকের সুখই আমাদের সকল কার্য্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত হয়, তবে কেবল মিল নহে, সকল মনুষ্যই সত্য বলিয়া অনন্ত নরকে গমন করিলে, সে লক্ষ্য কোথায় থাকে? বাস্তবিক এ কথাটি যদি কেবল অলঙ্কার

মাত্র না হয়, যদি যথার্থই উহা তাঁহার হৃদ্‌গত কথা হয়, তাহা হইলে বলি যে এস্থলে মিলের হৃদয়ের ভাব তাঁহার দার্শনিক মতের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার নৈতিকদর্শন অধিকাংশের সুখকেই লক্ষ্য করিতে বলে, কিন্তু তাঁহার ভাব তাঁহাকে এমন এক উচ্চ স্থানে উত্থিত করিয়াছিল, যেখানে মানুষ সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল মাত্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলে,—কেবল সত্যকেই সমাদর করে। এই উচ্চ অবস্থাতেই প্রকৃত সুখ অবস্থিতি করে। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষ-নীতিই মানুষকে প্রকৃত সুখের অধিকারী করে।

যাহা হউক নৈতিক বাধ্যতা সম্বন্ধে যে কথা বলিতেছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রধান কথা এই যে, নৈতিক বাধ্যতা ও সামাজিক ভয় এক পদার্থ নহে। উভয় পদার্থের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; সুতরাং একটি হইতে আর একটি উৎপন্ন হইয়াছে, এমন কথা কখনই স্বীকার করিতে পরিনা। নৈতিক বাধ্যতা এমন উচ্চ ও মহৎ ভাব, এবং ভয় এমন নিকৃষ্ট ও হীন ভাব যে বংশপরম্পরায় বৈজিক নিয়মানুসারে একটি ভাব আর একটি ভাবে পরিণত হইয়াছে, ইহা অসার কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।*

পুনর্ব্বার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, নৈতিক বাধ্যতাবোধ কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাধ্যতাবোধে

---

* Vide '*Religion as affected by Modern Matirialism*', P. 24. By James Martineau L. L. D., D. D.

দুই ব্যক্তি বুঝা যায়। আমাদের অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত একটি বিষয়ে বিবেকের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য বৃত্তি আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে মাত্র, বিবেক আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানে বা বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুমতি করে। মনুষ্যের পশু প্রবৃত্তি নিচয় সচরাচর অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু প্রবল হইলেও মানব হৃদয়ে তাহারা দস্যুর ন্যায় কার্য্য করে। বিবেক পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে আদেশ করে। (Conscience speaks in the imperative mood) বিবেক কখন কোন কার্য্যসম্বন্ধে বলেনা যে, উহা করা ভাল বা উহা করা মন্দ। বিবেক বলে, "এই ভাল কার্য্য কর।" "এই মন্দ কার্য্য করিও না।" বিবেক আমাদিগকে বাধ্য করে।

কিন্তু এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মানব-হৃদয়ে বিবেক বলিয়া কোন শক্তি বা বৃত্তি থাকিলেও আমরা তাহাকে মানিতে বাধ্য কেন?

অসচ্চরিত্র, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ব্যক্তিগণ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে; কিন্তু আমি সে কথা বলিতেছি না। চিন্তাশীল দার্শনিকেও এমন কথা বলিতে পারেন। কথাটির গম্ভীর তাৎপর্য্য আছে।

বিবেককে মানিব কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, মানিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, না মানিলে তোমার সর্ব্বনাশ।

এখন হিতবাদী বলিলেন যে, যদি মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া

কার্য্য করিতে হইল, তবে হিতবাদ অস্বীকার করা হইল কই? হিতবাদের মত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যে, দুঃখ ও বিপদকে ডাকিয়া আনিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

যাঁহারা কেবল সুখদুঃখজ্ঞানের উপরে নীতিতত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান, আমি তাঁহাদেরই কথার প্রতিবাদ করিতেছি। এই পর্য্যন্ত প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য যে, আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বিবেক বা নৈতিক দায়িত্ব বোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহারই অনুগত হইয়া চলিলে আমাদের মঙ্গল, না চলিলে সর্ব্বনাশ। এই স্বাভাবিক বিবেকের সত্তা যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহাদের মত আমরা অসার ও অযুক্ত বলিয়া মনে করি।

বাধ্যতাবোধে দুই ব্যক্তি বুঝায়। একজন বাধ্য করে, আর একজন বাধ্য হয়। সুতরাং মানুষের নৈতিক বাধ্যতা বোধ, মানুষের উপর আর এক অদৃশ্য ব্যক্তির অভিভাবকতা প্রকাশ করিতেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। মানুষ আপনার নৈতিক বাধ্যতা বোধের অনুগত হইয়া নৈতিক কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় পরমেশ্বরের নৈতিক বাধ্যতা বোধ থাকিতে পারে না; কেননা তাঁহার উপরে কেহ নাই। "তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং" তবে তিনি কেমন করিয়া নৈতিক কার্য্য করেন? তিনি আমাদের ন্যায় নৈতিক বাধ্যতা অনুভব করেন না; অনন্ত স্বরূপের পক্ষে তাহা অসম্ভব। পবিত্রতা

ও মঙ্গল তাঁহার স্বরূপ,—তাঁহার স্বভাব। সুতরাং পবিত্র ও মঙ্গলকর কার্য্য স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হয়। পুষ্প চন্দন যেমন স্বভাবতঃ সুগন্ধ দান করে, নৈশ সমীরণ যেমন স্বভাবতঃ শীতল করে, সুস্নিগ্ধ সলিল যেমন স্বভাবতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেই রূপ সত্য. মঙ্গল, ও সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ তাহা হইতে উৎসারিত হইতেছে। তিনি মন্দ করিতে পারেন না। তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ও বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু কখন মন্দ হইতে বা করিতে পারেন না। তিনি—অনাদি অনন্ত, অপরিসীম ভাল। "তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং।" বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভাল হইতে হয় না।

মানুষও যত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তত সে পরমেশ্বরের স্বভাব লাভ করে। মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম ক্রমশঃ স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া যায়। "উত্তমা সহজাবস্থা।" যে পরিমাণে প্রেমের বিকাশ, সেই পরিমাণে বাধ্যতা বোধের বিনাশ। সন্তান ক্রমশঃই পিতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয়। মাতা যেমন স্বভাবতঃ সন্তানকে ভাল বাসেন, সন্তানের সেবা করেন; উন্নত সিদ্ধ সাধুও সেই রূপ স্বভাবতঃ জীবকে ভাল বাসেন, স্বভাবতঃ তাহার সেবা করেন;—স্বর্গীয় প্রেমের প্রবাহে তাঁহার নৈতিক বাধ্যতাবোধ ডুবিয়া যায়।

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেক সম্বন্ধীয় যুক্তি এবং সৃষ্টি কৌশল মূলক যুক্তির মধ্যে প্রভেদ কি? সৃষ্টি কৌশলে অভিপ্রায় প্রকাশ পায়; স্বাভাবিক বিবেকের মধ্যেও অভি-

প্রায় প্রকাশ পায়, উভয় স্থলেই সৃষ্টি কৌশল। সুতরাং উভয় স্থলেই এক জ্ঞানময়ী শক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

বিবেক সম্বন্ধীয় যুক্তিতে আরও কিছু অধিক আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিবেকে বা নৈতিক বাধ্যতা বোধে দুইজন বুঝায়। বিবেক আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে, উপদেশ দিতেছে, তিরস্কার করিতেছে। আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, বিবেক তাহার বিপরীত আদেশ করিতেছে। কখন বিবেকের আদেশের সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিলাইয়া লইতেছি, কখন বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতেছি। কিন্তু যখন বিবেকের আদেশ উল্লঙ্ঘন করি, তখনও বিবেক তাহার কথা বলিতে ক্ষান্ত হয় না। বিবেকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? পরিচালক, পরিচালিত; নেতা, নীত; উপদেষ্টা, উপদিষ্ট; শিক্ষক, শিক্ষিত; তিরস্কর্ত্তা, তিরস্কৃত; এই সুস্পষ্ট সম্বন্ধ অনুভব করি। যে পরিচালক, সেই পরিচালিত; যে নেতা, সেই নীত; যে উপদেষ্টা, সেই উপদিষ্ট; যে শিক্ষক, সেই শিক্ষিত; যে তিরস্কর্ত্তা, সেই তিরস্কৃত; এমন কি কখন হয়?

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন আছেন। সক্রেটিস্ বলিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একজন আত্মা নিরন্তর থাকেন। তিনি যখনই কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই আত্মা তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে নিষেধ করিতেন।

সক্রেটিস্ যাহা বলিতেন; আমরা প্রত্যেকে কি তাহা বলিতে পারি না? আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে একজন আত্মা

কি নিরন্তর বাস করিতেছেন না? যখনই আমরা কোন দুষ্কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ কি তিনি তাহা নিষেধ করেন না?

পরমেশ্বরের বাণী।

বিবেক রূপ কর্ণে আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করি; অথবা বিবেক পরমেশ্বরের বাণী। ঐ ঘড়িটা যেমন দিবারাত্রি টিক্ টিক্ করিয়া সময় বলিয়া দিতেছে, সেই রূপ তোমার আমার প্রাণের ভিতর এমন কিছু আছে, যাহা আমাদিগকে নিরন্তর বলিতেছে, "এই কাজ কর, ঐ কাজ করিও না।" সামান্য কাজ হউক, আর বড় কাজই হউক, বিবেক সর্ব্বদাই কিছু না কিছু করিতে বলিতেছে,—এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই।

থিওডোর পার্কারের বাল্য জীবনের একটি গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন। চারিবর্ষ বয়স্ক পার্কার সন্ধ্যার সময়, পিতার গোলাবাড়ী হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথ সন্নিহিত ক্ষুদ্র পল্বলে একটি কচ্ছপ দেখিলেন। দেখিয়া বালস্বভাব সুলভ চপলতা বশতঃ তাহাকে প্রহার করিবার জন্য হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিলেন; কিন্তু মারিতে পারিলেন না। গৃহে আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমি কচ্ছপকে মারিব বলিয়া যষ্টি উত্তোলন করিলাম, কিন্তু কে আমাকে মনের ভিতর হইতে মারিতে বারণ করিল? আমি মারিতে পারিলাম না। যে আমাকে বারণ করিল, সে কে মা?"

শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক মাতা বলিলেন,

'বৎস! লোকে উহাকে বিবেক বলে। আমি বলি, উহা মানবহৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী।”

পার্কারের মাতা যে কথা বলিয়াছিলেন, উচ্চতম দর্শনও সেই কথা বলিতেছেন;—বিবেক মানব হৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী। এস্থলে পণ্ডিতজনের জ্ঞান এবং নারীহৃদয় সুলভ ভক্তির সম্মিলন হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তির মধ্যে কখন বিরোধ নাই। জ্ঞান ও ভক্তির বিবাহে তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

(পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ভ্রম প্রদর্শন।)

ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সর্ব্বত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াছি,—নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে কি না? এই সাকার উপাসনা প্লাবিত দেশের সকল প্রদেশেই নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে সংশয় বা আপত্তি দৃষ্ট হয়। উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশে অনেকের মনে এই সংশয় বা আপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়া দেশের নানা স্থানে প্রচারিত হওয়াতে অনেকের হৃদয়ে উক্ত আপত্তি দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

আমি নিরাকার উপাসক। আমার বিশ্বাসকে যখন অসার ও অযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে, আমার ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করা হইতেছে, তখন আমি নিশ্চিন্ত

থাকিতে পারি না। আমার ধর্ম্মবুদ্ধি বলিতেছে, "সত্যের সমর্থন কর"; ধর্ম্মবুদ্ধির সেই আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়াই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

প্রথমেই দুটি কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিব। অনেকগুলি কথার সমালোচনা করিতে হইবে, সুতরাং বক্তৃতা দীর্ঘ হইলে ক্ষমা করিবেন। আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার সকল কথাগুলি শ্রবণ করেন, বাধিত হইব। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্য জীবনের যাহা উদ্দেশ্য, অদ্যকার আলোচনারও তাহাই উদ্দেশ্য,—সত্যলাভ। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষেব পক্ষ সমর্থন কবা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি বিশেষ যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাও ভাল, কিন্তু সত্য জয় লাভ করুক। সম্প্রদায় বিশেষ যদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহাও ভাল, কিন্তু সত্য জয়লাভ করুক। প্রত্যেকে এই কথা বলুন, "আমার জয় চাই না, সত্যের জয় হউক।" (উচ্চ করতালি)

নিরাকারকে কি বাস্তবিক ভাবা যায় না? দুই একটি সহজ বিষয় ভাবিলেই এ বিষয়টি বুঝা যায়, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমাদের মানসিক ভাব সকল কি? সে সকলের কি আকৃতি আছে? মন ও মনের ভাব সকল দীর্ঘ না হ্রস্ব, ত্রিকোণ না চতুষ্কোণ, লোহিত না পীত? সকলেই জানে মনকে আমরা মনের দ্বারাই জানি, তাহার কোন মূর্ত্তি নাই।

মানুষ সুখ যেমন চায়, এমন আর কিছুই নহে। সুখের জন্য মানুষ সাগর পার হইতেছে, গিরি লঙ্ঘন করিতেছে; সুখের জন্য শত প্রকার কষ্টকেও আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না। কিন্তু সুখকে কি কেহ কখন চক্ষে দেখিয়াছেন? হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন? রসনায় আস্বাদ করিয়াছেন? সুখের কি কোন রূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সুখ সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত অথচ এই সুখের জন্য মনুষ্য ইহ সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

দুঃখ সম্বন্ধেও সেই কথা। মানুষ দুঃখকে যত ভয় করে, এত আর কাহাকেও নহে। সামান্য একটি ব্রণের যন্ত্রণায় লোক অস্থির হয়। কিন্তু দুঃখ কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি কেহ কখন দুঃখকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? দুঃখের কি কোন আকার আছে? উহা কি কোন প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট?

ভালবাসা কাহাকে বলে সকলেই জানেন। মাতা সন্তানে, বন্ধু বন্ধুতে, স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা রূপ রজ্জুতে বদ্ধ। ইহা সমগ্র জনসমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহা নিরাকার রজ্জু। কেহ কি কখন চর্ম্মচক্ষে ভালবাসা দেখিয়াছেন? যাহার জন্য মানুষ পাগল, কেহ কখন তাহা চক্ষে দেখে নাই, হস্তে স্পর্শ করে নাই, রসনায় আস্বাদন করে নাই; তাহা কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই নিরাকার ভাবিতে পারেন, অজ্ঞান লোকে পারেনা। ইহা

কি প্রকৃত কথা? সুখ দুঃখ প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব কি সকলই মনুষ্যই অনুভব করে না? কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কি হর্ষ, শোক, প্রেম, ঘৃণা, প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না? নিরাকার কাঁদায়, নিরাকার হাঁসায়, নিরাকারে বলায়, নিরাকারে চলায়, নিরাকারে ভব সংস্যারে নিরন্তর বিঘূর্ণিত করে, অথচ বল নিরাকারকে অনুভব করা যায় না?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, এই সকল মানসিক ভাব নিরাকার বটে, কিন্তু সাকার ভিন্ন ঐ সকল ভাব কখন মানব হৃদয়ে উত্তেজিত হয় না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একথা বলিয়াছেন। দুঃখীর মূর্ত্তি না দেখিলে হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না, প্রিয়তমের মূর্ত্তি না দেখিলে প্রেমের উদ্ভব হয় না। ইহা কি সত্য কথা? অনেক স্থলে সত্য; সকল স্থলে নহে।

যাঁহারা বলেন, সাকার পদার্থকে না দেখিলে নিরাকার ভাবের উৎপত্তি হয় না, একটি বিষয় তাঁহাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। সাকার অগ্রে না নিরাকার অগ্রে? এই যে আলোক আমার সম্মুখে রহিয়াছে, উহার একটা মূর্ত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্মুখে যে আলোক রহিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিলাম? কে আমাকে উহার সংবাদ দিল? আমার মন। এই আমার চতুঃপার্শ্বে জলস্থলশূন্যে যে অগণ্য অসংখ্য পদার্থ রহিয়াছে, কে আমাকে সে সকলের সত্তার সংবাদ জানিয়া দিতেছে? আমার জ্ঞান।

এখন দেখুন, মন বা জ্ঞান নিরাকার পদার্থ। অখিল

ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে, কিন্তু মন না থাকিলে আমার সম্বন্ধে উহার অস্তিত্ব কোথায়?

সাকার ভিন্ন নিরাকার ভাবের উদ্ভব হয় না; এ কথা সত্য হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত কথাই সত্য। নিরাকার ভিন্ন সাকার পদার্থের জ্ঞান কখন সম্ভব নহে। নিরাকার অগ্রে, সাকার পরে; নিরাকার ভিত্তিমূলে, সাকার দণ্ডায়মান।

মূর্ত্তি না দেখিলে যে প্রেম প্রভৃতি হৃদয়েব ভাবের উদ্ভব হয় না, সকল স্থলে এ কথা স্বীকাব কবিতে পারি না। ঈশা বলিয়াছেন, অপর মনুষ্যকে আত্মবৎ প্রীতি কর। অন্য কোন কোন সাধু বলিয়াছেন, অপর মনুষ্যকে আপনার অপেক্ষা প্রীতি কর। অন্যকে আত্মবৎ অথবা আপনার অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে, এমন মহাজন জগতে কয়জন আছেন? সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই অন্যেব অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভালবাসে। এস্থলে দেখুন যদি মূর্ত্তি-দর্শনেব উপব প্রেম নির্ভর করিত, তাহা হইলে সাধাবণতঃ আপনার অপেক্ষা অন্যের প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই অধিক হইত। আমারা অন্যেব মূর্ত্তি যেমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, নিজেব মূর্ত্তি কি সেই রূপ দেখিতে পাই? মধ্যে মধ্যে দর্পণে দেখি, সত্য; কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন এবং চক্ষুদ্বারা প্রকৃত মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দর্শন, এ উভয়ে কি তারতম্য নাই? দর্পণে মুখ দেখি, আবার তাহা ভুলিয়া যাই।* বোধ হয়, অনেকেবই ঐরূপ হয়। ক্ষণকালের জন্য প্রতিবিম্ব দর্শনের ফল কি স্থায়ী হওয়া সহজ?

* জন্মান্ধ কখন দর্পণেও মুখ দেখে নাই।

নিরাকার ভাবা যায় না, সুতরাং নিরাকার উপাসনা অসম্ভব, এ কথার যুক্তি-যুক্ততা যিনি বিচার করিতে চান, তিনি একটী পৌত্তলিকক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। কুম্ভকার যখন মূর্ত্তি সংগঠন করিল, তখন উহাকে কেহ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। যখন পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান করিলেন, তখনই উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইল। পূজা শেষ হইয়া গেলে বিসর্জ্জন করা হইল, তখন উহাতে আর দেবত্ব রহিল না। জিজ্ঞাসা করি, কেহই কি কখন দেখিয়াছেন যে, প্রতিমাতে দেবতা প্রবেশ করিতেছেন? কেহ কি কখন চক্ষে দেখিয়াছেন যে, প্রতিমার মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠান করিতেছেন? কেহ কি কখন দেখিয়াছেন যে, উপযুক্ত সময়ে প্রতিমা হইতে বাহির হইয়া দেবতা চলিয়া যাইতেছেন? কেহই বলিবেন না যে, তিনি কখন বাস্তবিক দেখিয়াছেন। সাকার উপাসক ইহাই বলিবেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রতিমাতে দেবতা অধিষ্ঠিত হন, এবং যথাকালে দেবতা চলিয়া যান।

জিজ্ঞাসা করি, তবে নিরাকার উপাসনা অসম্ভব হইল কেন? তোমারও বিশ্বাস, আমারও বিশ্বাস; বিশ্বাসই যখন উভয় প্রকার উপাসনার ভিত্তি মূল, তখন নিরাকার উপাসনার দোষ কি?

সাকার উপাসক বলিবেন যে, আমার একটা অবলম্বন আছে, তোমার অবলম্বন কোথায়? কি আশ্চর্য্য! মৃত্তিকা,

প্রস্তর, বা কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি অবলম্বন হইতে পারে, আর এই সুবিশাল সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড অবলম্বন হইতে পারে না? ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সুন্দর, মনোহর, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রত্যেক পদার্থ কি পরমেশ্বরের পূজার অবলম্বন হইতে পারে না? মনুষ্য হস্তগঠিত-মূর্ত্তি অবলম্বন হইতে পারে, আর স্বয়ং পরমেশ্বর নিজ হস্তে যাহা সংগঠন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন হইতে পারে না?

উপনিষদ্ বলিতেছেন, "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ;" ধীর ব্যক্তি সকল পদার্থে সেই পরমেশ্বরকে চিন্তা করেন।

পুত্তলিকা কি অবলম্বন হইতে পারে?

সাকার উপাসক বলিতে পারেন যে, যখন উভয় প্রকার উপাসনাতেই অবলম্বন রহিয়াছে, তখন নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ কিসে? উভয় স্থলেই অবলম্বন আছে সত্য, কিন্তু অবলম্বনের প্রভেদ অনেক। অসীম অনন্ত পরমেশ্বরকে নিরবলম্বভাবে চিন্তা করিতে না পারিলে, সৃষ্ট পদার্থের অবলম্বনে তাঁহার উপাসনা করিতে পার। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছেন, আমি উহা একেবারে ধারণা করিতে পারিব না বলিয়া পদার্থ বিশেষে তাঁহার সত্তানুভব করিতে যত্ন করিতে পারি। কিন্তু আমি মনে মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি, যে আমার ঈশ্বর অসীম বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সাকার উপাসকগণ কি সেইরূপ ভাবে প্রতিমাতে তাঁহার সত্তানুভব করেন? আত্মার অনুন্নত অবস্থা নিবন্ধন আমি নিরন্তর, দিবা রজনী, বিশ্বকার্য্যে, অন্তরে

বাহিরে, তাঁহার সত্তানুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কখন মনে করিনা যে, যে পদার্থ বা স্থানে আমি তাঁহার সত্তানুভব করি, তাহা হইতে তিনি চলিয়া যান। সাকার উপাসক কি সেইরূপ মনে করেন যে তাঁহার দেবতা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রতিমাতে চিরদিন বর্ত্তমান? কখনই প্রতিমা হইতে চলিয়া যান না?

কোন কোন সাকারবাদী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমাদিগকে পৌত্তলিক কেন বল? আমরা কি পুতুলের পূজা করি?" পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "হিন্দুরা তো কখই পুতুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন না। পুতুলকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া তাহাতেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাবিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করেন।" "আভ্যন্তরিক ভাব সংগ্রহ ও একাগ্রতার সাহায্যের নিমিত্তেই কেবল প্রতিমার প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিজের সম্বন্ধে এসকল কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সাকার উপাসক কি বাস্তবিকই প্রতিমূর্ত্তিকে অবলম্বনমাত্র মনে করেন? সর্ব্বব্যাপী অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত ভাবিয়া আমাদের দেশের কোটি কোটি নরনারী কি তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন? নিশ্চয়ই সে ভাব নয়।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর প্রধান ধর্ম্মোৎসব। এই দুর্গোৎসবের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন, উহা প্রকৃত কথা কি না? সর্ব্বসাধারণ লোকে কি বিশ্বাস করে? আদ্যাশক্তি

ভগবতী কৈলাসে সংবৎসর থাকেন; তিন দিনের জন্য বঙ্গবাসী ভক্তের গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। আদ্যাশক্তি যথার্থই কৈলাসে থাকেন, নতুবা কৈলাস পর্ব্বত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কি সত্য সত্যই কৈলাস হইতে বঙ্গভূমিতে তিন দিনের জন্য আসেন? সত্য সত্যই কোন বার দোলায়, কোন বার ঘোড়ায়, কোন বার নৌকায় আরোহণ করিয়া এদেশে আসেন? (শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন,—"রেলে আসেন না?") না; যে সময়ে উহা কল্পিত হইয়াছিল, সে সময়ে রেল ছিল না; নতুবা রেলেও আসিতেন। আদ্যাশক্তি কেবল তিন দিনের জন্য আসেন? তিনি আমার এই বক্ষস্থলে কি তিনশতপয়ষট্টি দিন নিরন্তর বাস করিতেছেন না? আমাদের প্রত্যেকের চরণাঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সমগ্র দেহে কি আদ্যাশক্তি ভগবতী এই মুহূর্ত্তেই প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন না? নতুবা এ শরীর কোথায় থাকিত? আত্মার আত্মারূপে কি তিনি আত্মার অভ্যন্তরে অধিবাস করিতেছেন না? নতুবা আত্মার অস্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

আদ্যশক্তি অর্থ কি? যে শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত। ইংরেজী ভাষায় উহাকেই First Cause বলে। সেই আদি কারণ, সেই মূল শক্তি, প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি না করিলে কি এই ব্রহ্মাণ্ড বিলোপদশা প্রাপ্ত হয় না? মহর্ষিগণ সেই জন্য তাঁহাকে "প্রাণস্য প্রাণং" * বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরু শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোয়ে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্।"

ভগবতী ভক্তের ভবনে তিন দিন অবস্থিতি করেন। তারপর তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। বিসর্জ্জন দিওনা। প্রাণের সিংহাসনে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রাখ। আর, বাস্তবিক কি কেহ প্রাণের প্রাণকে বিসর্জ্জন দিতে পারে? তুমি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেও, কিন্তু তিনি তোমাকে ছাড়েন না। সেই জন্যই তপোনিষ্ঠ মহর্ষি উপনিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন, "মাহংব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামাব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

প্রাণের প্রিয়তমকে কেহ বাহিরে রাখিতে ইচ্ছা করে না। যাহাকে তুমি প্রাণের সহিত ভাল বাস, তাহার মধ্যে ও তোমার মধ্যে আকাশের ব্যবধান কি ভাল লাগে? প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে প্রাণের ভিতরে রাখিতে চাই। সেইজন্য বাহ্য পূজা ভাল বাসি না। প্রতিমা সংগঠন কর, বাহিরের প্রতিমা বাহিরেই থাকিবে। যিনি "প্রাণস্য প্রাণং", তাঁহাকে প্রাণমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে চাই। তিনি প্রাণ; প্রাণের আবার প্রতিমা কি? তপোনিষ্ঠ মহর্ষি বলিতেছেন, "নতস্য প্রতিমা অস্তি।"

তাঁহারা নিশ্চয়রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন

পৌত্তলিকতা কি অনন্ত ঈশ্বর পূজা ?

সাকারবাদীগণ যে পুত্তলিকায় "ঈশ্বরের পূজা করেন," এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। এই যে অকুল সমুদ্রের ন্যায় হিন্দু সমাজ, ইহার সর্ব্বত্র যে পূজা প্রণালী প্রচলিত,তাহা কি সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে? প্রতিমা কি যথার্থই সেই পূজার অবলম্বন মাত্র? চক্ষু কর্ণই থাকিতে কখন একথা স্বীকার করিতে পারি না।

ঘরে ঘরে কি হইতেছে দেখুন। যদি অনন্ত পরমেশ্বরেরই পূজা করা হয়, এবং প্রতিমা কেবল তাহার অবলম্বন মাত্র, তবে প্রতিমূর্ত্তির জন্য স্নান, আহার, ও শয্যার বন্দোবস্ত করা হয় কেন? মশকের উপদ্রব হইলে গৃহ-বিগ্রহকে মশারি করিয়া দেওয়া হয় কেন? অনন্ত পরমেশ্বরকে মশা কাম্‌ড়াইবে? সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ যে, আমরা অনন্ত পর-মেশ্বরেরই পূজা করি, প্রতিমা অবলম্বন মাত্র। কিন্তু চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট দেশবাসীগণকে উহা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়-ম্বনা মাত্র। জগন্নাথের স্নান যাত্রা কি? ঘড়া ঘড়া জল জগ-ন্নাথের মস্তকে ঢালা হয় কেন? আমার বাসস্থানের নিকট-বর্ত্তী মাহেশ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ দেবের অবস্থা প্রতি বৎসর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা সহস্র সহস্র লোকের প্রত্য-ক্ষের বিষয়। এই সে দিন স্নান যাত্রা হইল; স্নানের পরই ঠাকুরের ঘোরতর সর্দ্দি উপস্থিত। বাস্তবিক, এত জল ঢালা হয় যে, তাহাতে শরীর সুস্থ থাকিবার কথা নয়। সর্দ্দির উপর আবার মাথা ধরা। পাণ্ডাগণ জানেন যে, মানুষের

মাথা ধরিলে কাপড় বাঁধিয়া দিলে আরাম বোধ হয়, অতএব তাঁহারা জগন্নাথের মস্তক কাপড় দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া দিলেন। কেবল ইহাই নহে; ঠাকুরের জ্বর হইল। জ্বর আরোগ্যের জন্য পাঁচনের ব্যবস্থা করা হইল। অনেক স্ত্রীলোক পাঁচনের পয়সা দিয়া পুণ্য লাভ করিলেন। পীড়িতাবস্থায় পথ্যের জন্য দেবতাকে খই দেওয়া হইল। ক্রমে তাঁহার নব যৌবন হইল। স্বচক্ষে দেখিয়াছি নব যৌবনের সময় জগন্নাথের বড় সৌন্দর্য্য হয়। রথের পর ঠাকুর ক্ষুদে মাসির বাটীতে আসেন। সেখানে আসিয়া ক্ষুদের বড়া আহার করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের অবস্থা এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। এমন কি, মাহেশে শ্রীক্ষেত্রের অনুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে মাত্র। তারকেশ্বর মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ দেবতা। ইনি সিদ্ধি ও গাঁজা বিলক্ষণ খাইয়া থাকেন। ঠাকুরকে তালের জটা দিয়া আলবোলায় গঞ্জিকা সাজিয়া দেওয়া হয়। যখন আগুণ ধরিয়া তালের জটা পট্ পট্ করিতে থাকে, তখন ভক্তগণ বলিয়া উঠেন, "ঐ শুন, ঠাকুর গাঁজা টানিতেছেন।" আপনারা শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে, কোন গৃহস্থের গৃহে দেব-বিগ্রহ প্রত্যহ মল মূত্র ত্যাগ করিতেন। ঠাকুর রজনী যোগে যাহা কিছু আহার করিতেন, প্রাতঃকালে তাহা নির্গত হইত। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ উপস্থিত হইয়া প্রসাদ বলিয়া উহা ভক্তিপূর্ব্বক আহার করিতেন। উক্ত প্রসাদের চমৎকার নামটি শুনিবেন? উহার নাম "হগ্গা প্রসাদ।" কেহ মনে করিবেন না যে, আমি বিদ্রুপ করিবার জন্য এই সকল কথা

বলিতেছি। যাঁহারা বলেন যে, সাকার উপাসকগণ পুত্তলি-কায়, "ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাবিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করেন" তাঁহাদের কথার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই বাস্তব ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম।

পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে? কেবল পুতুল পূজা পৌত্ত-লিকতা নহে। পৌত্তলিকতা শব্দের মূল অর্থ যাহাই কেন হউক না, এক্ষণে উহার অর্থ, সৃষ্ট-পদার্থের বা মনঃকল্পিত পদার্থের উপাসনা। প্রচলিত পৌত্তলিকতার দুটি প্রধান অংশ,—পুতুল পূজা ও জড়োপাসনা। জড়োপাসনা কিরূপে উৎপন্ন হই-য়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা সহজেই বুঝিতে পাবেন। জড়জগতে যাহা কিছু অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও হিতকারী, মনুষ্য স্বভাবতঃ তাহাকেই দেবতা বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করি-য়াছে। বায়ু জগতের কত উপকার করে, বায়ুর কত ক্ষমতা; অতএব উহা দেবতা। জল কত প্রকারে হিত-সাধন করিতেছে, জল ভিন্ন মনুষ্যেব দিন চলে না; অতএব উহা দেবতা। অগ্নির কত প্রভাব, সকল পদার্থ-কেই ভস্ম করিয়া দিতে পারে; অতএব উহা দেবতা। বজ্র বিদ্যুৎ কেমন আশ্চর্য্য পদার্থ! বজ্র নিমেষ মধ্যে প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করে; গৃহাদি ভগ্ন, বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে; অতএব উহা দেবতা। বটবৃক্ষ কেমন প্রকাণ্ড! নিদাঘ তাপে ছায়াদান করিয়া কত প্রাণীর উপকার করে; অতএব উহা দেবতা। কত আর বলিব! সামান্য পশু পক্ষী হইতে আকাশবিহারী সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা পর্য্যন্ত সকলই

দেবতা; সকলই মানুষের পূজার পদার্থ। * জিজ্ঞাসা করি' সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি কি ঈশ্বর পূজার অবলম্বন মাত্র? নিরাকার-উপাসকের পক্ষে তাহাই বটে; কিন্তু এই যে আমাদের হিন্দু-সমাজভুক্ত কোটি কোটি নরনারী, ইঁহারাও কি সেইরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন? সূর্য্য স্বয়ংই দেবতা; তিনি কশ্যপের পুত্র; তাঁহার নিজেরও পুত্র কন্যা আছে † তিনি রথারোহণে

* আদিমকালে ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকল পদার্থই মনুষ্যের নিকট দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। গগনবিহারিণী, বিশ্ব উজ্জ্বলকারিণী, আশ্চর্য্য শক্তিধারিণী সৌদামিনী যে, জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে; শত শত শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত কি উহা বুঝিতে পারা সম্ভবপর হইতে পারে? জগতের পদার্থ ও ঘটনা সকল আশ্চর্য্য শক্তি, জ্ঞান, ও মঙ্গলভাব প্রকাশ করিতেছে। বিজ্ঞানান্ধ মনুষ্য কেন তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না? পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে যখন প্রথম চলিয়াছিল, কোন কোন স্থানের কৃষকেরা দলে দলে আসিয়া রেলগাড়ীকে দেবতা ভাবিয়া ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিল। শিশু যে জন্য ঘড়িকে প্রাণ বিশিষ্ট ভাবে, জড়জগতে সেই জন্যই দেবতার সৃষ্টি হয়। কেবল জড়জগতে কেন? অন্তর্জগতেও দেবতা সৃষ্টি হইয়া থাকে, কাম ও রতি দেবতা বলিয়া পূজিত। জ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিকাশ হইলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বা অত্যন্ত উপকারী মনুষ্যও দেবতা বলিয়া পূজিত হন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি এইরূপে দেবতা হইয়াছেন। একই মূল হইতে জড়োপাসনা ও অবতারবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা আছে। পণ্ডিতেরা কল্পনা বলে যে সকল দেব মূর্ত্তির রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন, অজ্ঞান লোকে তাহাকেই সত্য ভাবিয়া পূজা করিতেছে। কালী, জগদ্ধাত্রী, প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তির এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে।

† শনি, যম, ও মনু সূর্য্যের পুত্র। যমুনানদী সূর্য্যের কন্যা।

আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন। ইহাই কি সাধারণ বিশ্বাস নহে? অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও ঐ প্রকার। তাহারা ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বন নহে; তাহারা স্বয়ংই এক এক দেবতা হইয়া প্রতিদিন হিন্দুসমাজের পূজা গ্রহণ করিতেছে।

সগুণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস।

আপাততঃ পৌত্তলিকতার কথা ছাড়িয়া দিয়া নিরাকার উপাসনা বিষয়ে আর একটি কথা বলি। আমরা পদার্থের গুণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ, বর্ণ প্রভৃতি গুণ ভিন্ন জড়ের আর কিছুই জানি না। সেইরূপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ভিন্ন মনের আর কিছুই জানি না। গুণাধার পদার্থকে আমরা জানিতে পারি না। সাকারকে জানি গুণ দ্বারা, নিরাকারকেও জানি গুণ দ্বারা। আসল চৈতন্যকেও জানি না, আসল জড় যদি কিছু থাকে তাহাকেও জানি না। পরমেশ্বরকেও সেইরূপ তাঁহার গুণদ্বারা জানি। গুণাতীত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গলভাব, প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকি। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার পদার্থেই যখন আমাদের গুণ গ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে তখন নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন?

কিন্তু এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরে জ্ঞান, দয়া, শক্তি প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে তুমি

কেমন করিয়া পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, দয়াময়, বা শক্তিময়, মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিবে? জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিলে কি দোষ হয়, একটি একটি করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক। দয়াময় বলিলে কি দোষ হয়? তর্কচূড়ামণি বলিতেছেন, "ঈশ্বরকে কেমন করিয়াই বা দয়াময় বলিব? অন্যের দুঃখে সহানুভূতি হইলে, অর্থাৎ অন্যের দুঃখ নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করিলে, তবে সেই দুঃখ মোচনের নিমিত্ত যে স্নায়বীয় ক্রিয়া (nervous action) হয়, তাহাকে আমরা দয়া বলিয়া বুঝি। দুঃখই দয়ার মূল। যাহাতে দুঃখ ও স্নায়বীয় ক্রিয়া উভয়ই সম্ভবে না, তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারি না।"

দয়া কি? দয়া শারীরিক পদার্থ না মানসিক পদার্থ? সকলেই বলিবেন যে, দয়া মনের অবস্থা বিশেষ। তবে দয়াকে স্নায়বীয় ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মনুষ্যের মনে দয়া, প্রেম, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি যে কোন ভাব উত্তেজিত হউক না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার স্নায়বীয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া স্নায়বীয় ক্রিয়াই দয়া নহে। * দয়া, প্রেম, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিপরীত ভাব নিচয়, সকলেই এক স্নায়বীয় ক্রিয়া হইতে পারে

---

*সেতারের তারে বিশেষ ভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে নানা প্রকার সুর ও রাগিণী উৎপন্ন হয়। তাই বলিয়া তারের সঞ্চালনকে সুর ও রাগ রাগিণী বলা উচিত নহে।

না। শারীরীয় ক্রিয়া ও দয়া যখন এক পদার্থ নহে, দয়া যখন একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা নহে, তখন পরমেশ্বরে দয়াগুণ সম্ভব হইবে না কেন? আর একটি কথা এই যে, মানবের মনে যখন দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার দুঃখানুভূতি হইয়া থাকে; অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব না করিলে দয়া হয় না। পরমেশ্বরের পক্ষে দুঃখ সম্ভব নহে; তবে তাঁহাকে কেমন করিয়া দয়াময় বলিব?

এই কথাটির পরিষ্কার মীমাংসা করিতে হইলে দয়ার লক্ষণা করা আবশ্যক। দয়া কি? অন্যের দুঃখ দূর করিবার নিঃস্বার্থ ইচ্ছাই দয়া। মানুষের পক্ষে ইহা সত্য বটে যে, মানুষ যখন অন্যের প্রতি দয়াবান হয়, তখন তাহার হৃদয়ে এক প্রকার ক্লেশানুভূতি হইতে থাকে, অন্যে যে কষ্ট পাই-তেছে, তাহা যেন নিজের বলিয়া বোধ হইতে থাকে; কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের পক্ষেও কি তাহাই হইবে? দেখুন দেখি, তর্ক চূড়ামণির কথাটা কিরূপ দাঁড়াইল। দুঃখানুভূতি ভিন্ন মানুষ দয়া করিতে পারে না, মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব, মানুষ যাহা পারে না, অনন্ত পরমেশ্বরও তাহা পারেন না!!! এরূপ কথা বলা কি ধৃষ্টতা নয়?

তর্কচূড়ামণির মতে, পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, কি ইচ্ছাময়, কিম্বা প্রভু বলাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি বলিতে-ছেন,—"আমাদের শরীরে যে সকল ক্রিয়া সংসাধিত হয়,

তাহাদের প্রথম স্ফূর্ত্তিকেই ইচ্ছা বলিয়া বুঝি। সুতরাং ইচ্ছা বলিলেই মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ও পেশীর অস্তিত্ব থাকা চাই। কিন্তু ঈশ্বরে মস্তিষ্ক, স্নায়ু মণ্ডলী বা পেশী কিছুরই কল্পনা করিতে পারি না ; তবে কেমন করিয়া বলিব ঈশ্বর ইচ্ছাময় ? জ্ঞান-ময় বলিতেও ঐ আপত্তি ; "জ্ঞানও ত আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক সাপেক্ষ ক্রিয়া-বিশেষ।" প্রভু বলিতেও আপত্তি ;—"প্রভু বলিলেও আমাদের পার্থিব ভাবই মনে আসে। যিনি দশজন বা বিশজন বা ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছা প্রয়োগ করেন, প্রভু বলিলে আমরা তাঁহাকেই বুঝি। সুতরাং তাহার মধ্যেও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ক্রিয়ার ভাব নিহিত থাকিল। তবে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রভু বলিব ?"

ইচ্ছা ও জ্ঞান শারীরিক পদার্থ না মানসিক পদার্থ ? সকলেই বলিবেন, মানসিক পদার্থ। ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়া মাত্র। তবে এ কথা সত্য যে, ইচ্ছা ও জ্ঞান-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার স্নায়বীয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। তর্কচূড়ামণির যুক্তি এই যে, মানুষের পক্ষে যখন শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া হয় না, তখন পরমেশ্বরের পক্ষেও শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত কেমন করিয়া ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া সম্ভব হইবে ? আমি তোমাকে বলিলাম যে, হলধর খোঁড়া দুই বগলে লাঠি দিয়া চলে, তুমিও কেন সেইরূপ চল না ? তুমি বলিলে হলধর লাঠির সাহায্য ব্যতীত চলিতে অক্ষম, সুতরাং তাহার পক্ষে লাঠি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি সে প্রকার অক্ষম নহি, আমি কেন লাঠি ব্যবহার

করিব? আমি বলিলাম, সে কি! হলধর মানুষ, তুমিও মানুষ, হলধরের গতিক্রিয়া, তোমারও গতিক্রিয়া; অতএব তাহার পক্ষে যখন লাঠি আবশ্যক, তোমার পক্ষেও কেন হইবে না?

এ যুক্তিটি যেমন, তর্কচূড়ামণির যুক্তিও সেইরূপ। মানুষ ইচ্ছা ও জ্ঞান বিশিষ্ট, পরমেশ্বরও ইচ্ছা ও জ্ঞান বিশিষ্ট; মানুষের পক্ষে ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া, পরমেশ্বরের পক্ষেও ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া; কিন্তু মানুষ যখন মানবীয় ক্রিয়া ব্যতীত ইচ্ছা ও জ্ঞান ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না, তখন পরমেশ্বরও অবশ্য পারেন না। এস্থলে আমরা তর্কচূড়ামণিকে বলিতে পারি যে, মানুষ ক্ষুদ্র, পরিমিত, অক্ষম; সুতরাং মানুষ উপায় অবলম্বন ব্যতীত কিছু করিতে পারে না। আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় মস্তিষ্কাদির সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু পারিমিত দুর্ব্বল মানুষ পারে না বলিয়া, অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরও পারেন না? হলধর খোঁড়া লাঠির সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না বলিয়া আমি সুস্থ পদ সত্ত্বেও পারিব না? মানুষ পরিমিত, দেশকালে বদ্ধ জীব, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সকলই দেশকালে বদ্ধ, সুতরাং তাহার পক্ষে শারীরিক উপায় গ্রহণ সম্ভব; কিন্তু যিনি অনন্ত, অপার, দেশকালের অতীত, তাঁহার পক্ষে কেমন করিয়া মস্তিষ্কাদি শারীরিক উপায় সম্ভব হইবে?

তর্কচূড়ামণির মতে ঈশ্বরকে শক্তিমান বলাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। তিনি বলিতেছেন,—"শক্তিময়ইবা বলিতে পারি কই? শক্তি

বলিলেও ত আমরা তড়িৎ, তাপ, তনূপ (magnetism) আকর্ষণ প্রভৃতি বুঝি। তাহাই বা কি প্রকারে ঈশ্বরে সমাবেশিত করা যায়?" কে বলিল যে, শক্তি বলিলে তড়িৎ, তাপ, ও তনূপ (magnetism) বুঝায়? শক্তি কি? শক্তি কি পদার্থ, না পদার্থের গুণ? শক্তি পদার্থ নহে; পদার্থের গুণমাত্র। আমার এই হস্ত কি শক্তি? না; এই হস্ত যে কার্য্য করে, তাহাই কি শক্তি? না; তবে শক্তি কোথায়? হস্তের কার্য্য কারিতাকেই শক্তি বলে। শক্তির প্রতিশব্দ ক্ষমতা। পদার্থের শক্তি বা ক্ষমতা একই কথা। তাড়িৎ ও (magnetism) এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ; সুতরাং নিজেই শক্তি হইতে পারে না। তবে এমন বলাই উচিত যে, তাড়িত ও magnetism এর শক্তি আছে। শক্তি বলিলে যখন কার্য্যকারিতা বা ক্ষমতা বুঝায়—শক্তি যখন পদার্থের গুণমাত্র, নিজে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন পদার্থ নহে, তখন পরমেশ্বরকে কেন শক্তিময় বলা যাইবে না? বাস্তবিক শক্তি নিরাকার ও ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ। পরমেশ্বরকে শক্তিময় বলিলে, এরূপ কখন বুঝিতে হয় না যে, পরমেশ্বরের ভিতরে তাড়িত ও magnetism রহিয়াছে।*

---

* পরমেশ্বরের চৈতন্য স্বীকার করিতেও তর্কচূড়ামণির আপত্তি। তিনি চৈতন্যের যে লক্ষণা করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার! চূড়ামণি বলিতেছেন,—"চৈতন্য কি? যাঁহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আমার ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধ নহে, জড় নহে, তাঁহারই নাম চৈতন্য।". এস্থলে অন্ধ ও জড় শব্দের অর্থ. চৈতন্যবিহীন। অত-

ঘোর নাস্তিকতা।

এখন, একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। যদি পরমেশ্বরে জ্ঞান, শক্তি, দয়া, প্রভুত্ব প্রভৃতি গুণ আরোপ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হইল, তবে প্রতিমাতে অথবা প্রতিমায় আভিভূর্ত দেবতায় সেই সকল গুণ কেমন করিয়া আরোপ করা হইবে? আর, ঐ সকল গুণ আরোপ করা ব্যতীত দেবপূজা কেমন করিয়া সম্পন্ন হইবে? আসলে যাহা নাই, নকলে তাহা কেমন করিয়া থাকিবে? যাহার খাঁদা নাক, তাহার ফটোগ্রাফে কি দিব্য টিকোল নাক হয়? তর্কচূড়ামণি সাকার উপাসনা সমর্থন করিতে গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছেন। উপন্যাস কথিত কালিদাসের ন্যায়, তর্কচূড়ামণি যে ডালে দাঁড়াইয়া আছেন,সেই ডালই কাটিতেছেন। চূড়ামণি বলিতেছেন,— "বাস্তবিক তাঁহাকে ইচ্ছা ময়, দয়াময়, শক্তিময়, উত্তাপময়, তেজোময়, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল বলাও যা,—আর বৃক্ষময়, কাষ্ঠময়, শিলাময়, মৃত্তিকাময়, খড়ময় বলাও তাই। কেন না, ইচ্ছা জ্ঞান,—বৃক্ষ, শিলা, সকলই* ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।" দয়াময়, ইচ্ছাময়, শক্তিময়, প্রভৃতি না বলিতে পারিলে ব্রহ্মোপাসনা যেমন অসবন্ত হয়, প্রতিমা পূজাও সেইরূপ অসম্ভব হয়। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার

---

* এ সমগ্র বাক্যটা কিরূপ হইল, দেখুন;—আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আমার ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় চৈতন্য-বিহীন নহে, তাহারই নাম চৈতন্য!

উপাসনাই মারা যায়। যদি তোমার শত্রুর দুটি চক্ষু অন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তোমারও দুটি চক্ষু যায়, তাহাতে কি সন্তুষ্ট আছ?

কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের দয়া, প্রেম, ইচ্ছা প্রভৃতি আছে, কিন্তু মানুষের নহে। ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। লক্ষণের ভিন্নতায়, পদার্থের ভিন্নতা হয়। এক লক্ষণাক্রান্ত হইলেই এক প্রকার পদার্থ হয়; ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলেই ভিন্ন পদার্থ হয়। বৃক্ষ পর্ব্বত নয়, পর্ব্বত বৃক্ষ নয়; মৃত্তিকা জল নয়, জল মৃত্তিকা নয়; হস্তী পিপীলিকা নয়, পিপীলিকা হস্তী নয়। কেন? যেহেতু এই সকল বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের দয়া, প্রেম, ইচ্ছা প্রভৃতিতে যে সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণ যদি ঐশিক গুণ সমূহে কিছুই না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকলকে দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছা কেমন করিয়া বলিব? দুই হাত নাই, দুই পা নাই, "দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়" না, দুই চক্ষু নাই, দুই কর্ণ নাই, উপর দিকে মাথা নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, বাক্-শক্তি নাই, অথচ উহা মনুষ্য; আকার ক্ষুদ্র, বড় বড় কর্ণ নাই, চারি পা নাই, দন্ত নাই, শুণ্ড নাই, ছোট ছোট দুটী চক্ষু নাই, অথচ উহা হস্তী; ইহাও যেমন কথা, আর আমরা যাহাকে দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছা বলি, তাহার কোন লক্ষণাক্রান্ত না হই-লেও পরমেশ্বরে যাহা আছে, তাহা দয়া, প্রেম, বা ইচ্ছা ইহাও তেমনি কথা। * বাস্তবিক কথা এই, পরমেশ্বরের দয়া, প্রেম

* তর্কচূড়ামণি বলিয়াছেন,—"আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, ইচ্ছা

প্রভৃতি অনন্ত; আমাদের দয়া, প্রেম প্রভৃতি পরিমিত; সুতরাং পরিমাণে কেবল ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন নহে। সুতরাং ভিন্ন পদার্থও নহে।

তর্কচূড়ামণি বলেন জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব। সুতরাং ঐ সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু মানবীয় ভাব বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমরা কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। মানবীয় বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য ভাবের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্য ভাব গ্রহণ করা মানবের পক্ষে অসাধ্য। জ্ঞান দয়া, প্রভৃতিকে মানবীয় গুণ ভাবিয়া

বলিলে যাহা বুঝি, ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহা ইহা নহে। জ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা, ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহা হইতে ভিন্ন। দয়া বলিলে যে ভাব আমাদের মনে উদয় হয়, ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহা ঐ দয়া নামে অভিহিত হইতে পারে না। আমাদের অভিমত শক্তিও, ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহার অন্য। আমরা পার্থিব দৃষ্টান্ত হইতেই এ সমস্ত সংজ্ঞা ঈশ্বরকে দিয়া থাকি।" এ ভয়ানক কথা! যদি কিছুই থাকিল না, তবে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব, কি বলিয়া তাঁহার পূজা করিব? তর্কচূড়ামণি কি সকল ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চান?

পরমেশ্বরে আরোপ করিতে অস্বীকার করিলে, পরমেশ্বরের পূজা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা পূজাও উঠিয়া যায়।

বিলাতের অজ্ঞেয়তাবাদীরা (agnostics) বিশ্বকারণের শক্তি স্বীকার করেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহাকে Inscrutable Power বলেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারক শক্তি পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছেন। শক্তি পর্য্যন্ত গেলে থাকিল কি? নাস্তিকতা ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্মের নামে নাস্তিকতা প্রচার হইতেছে। ভয়ানক কথা! শ্রবণ কর, হিন্দুধর্ম্ম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর; নাস্তিকতার গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি অনেক বিপদে বিপন্ন, তাহার উপর আর আমাকে নাস্তিকতা রাক্ষসীর গ্রাসে ফেলিয়া বিনষ্ট করিও না।" ইংরেজীতে একটী কথা আছে, "Save me form my friends;" এক্ষণে পুনরুত্থানকারী মহাশয়দের সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্ম বলিতে পারেন, "Save me from my friends"

মহাকবি মাইকেল মধুস্দনের একখানি প্রহসন পুস্তকে

---

* তর্কচূড়ামণি যে সূক্ষ্মসেতুর কথা বলিয়াছেন, উহা কল্পিত সেতু মাত্র। তিনি বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিতে গেলে, এক সঙ্কীর্ণ অতি সূক্ষ্মসেতু উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিলে নাস্তিকত্বের আশঙ্কা আছে; আর সে কথার গুরুত্ব অতি লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।" তর্কচূড়ামণির যুক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল নাস্তিকতা। যদি সূক্ষ্মসেতু দেখাইয়া না দিবেন, তবে লোককে এমন সংকট স্থানে আনিয়া ফেলিলেন কেন? যদি উপকার করিতে পারিবেন না, তবে বৃথা অনিষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল কি?

আছে যে, একজন "বৈরাগী কুড়াজাল হস্তে লইয়া হরিনাম করিতে করিতে কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময় এক সার্জ্জন সাহেব আসিয়া তাহার কুড়াজালি কাড়িয়া নিজ হস্তে লইয়া বলিতে লাগিল,"বাপ্‌রে পাপ্, হাম্ বড়া হিণ্ডু হুয়া! রাঢে কিস্‌ডে, রাঢে কিস্‌ডে।" হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীগণ প্রতিপন্ন করিতেছেন, পরমেশ্বরকে দয়াময় বলা যুক্তি-বিরুদ্ধ, বানর মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ, গোপনে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই, ইহা দেখিলে মাইকেলের সার্জ্জনকেই মনে পড়ে। এই "রাঢে কিস্‌ডে" হিন্দুধর্ম্ম অতি অপূর্ব্ব পদার্থ বটে!

আপনারা তিতুমিরের লড়াইয়ের কথা শুনিয়াছেন। চাচারা ইংরেজের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে দাড়ি কামাইয়া, সব হিন্দু সাজিলেন। যদি কাহাকেও সন্দেহ ক্রমে মুসলমান বলিয়া ধরা হইত, অমনি তিনি আপনার হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া উঠিতেন,—"আল্লার কিরে মুই হেঁদু।" সরল বিশ্বাসী পৌত্তলিকগণ আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আজকাল "আল্লার কিরে মুই হেঁদুর" দল অনেক।

ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে আব একটি আপত্তি এই যে, আমরা পরিমিত, পরমেশ্বর অনন্ত; পরিমিত হইয়া অনন্তের ভাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? তর্কচূড়ামণি বলিতেছেন, "ঈশ্বর ব্যাপক, ও অনন্ত, তাহা সত্য;—কিন্তু আমি যখন সীমাবদ্ধ, তখন আমাকর্ত্তৃক কথনই সেই অসীম ভাব গৃহীত হইতে পারে না।"

মানুষ কি অনন্তকে জানিতে পারে? অনন্তকে জানি, এমন নহে; জানিনা এমনও নহে অনন্তকে জানা যায় না, বলিলে কি বুঝায়? অনন্তকে জানি। যে বিষয় আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহা জানা যায়, কি, না যায় এ দুয়ের কিছুই জানি না। কিন্তু যাহার সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, উহাকে জানা যায় না, তাহাব বিষয়ে অবশ্য কিছু জানি; নতুবা কেমন কবিয়া জানিলাম যে, উহাকে জানা যায় না? যদি অনন্তের কিছুই না জানিতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে, অনন্তকে জানা যায়,* কি না যায়, এ দুয়ের কিছুই জানি না। কিন্তু যখন বলিতেছি যে, অনন্তকে জানা যায় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্তের স্বরূপ আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলে আমি কেমন করিয়া জানিলামযে, অনন্তকে জানা যায় না?

আর একটি কথা। পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। দীর্ঘ অর্থ কি? হ্রস্ব নয়; হ্রস্ব অর্থ কি? দীর্ঘ নয়। স্থূল অর্থ কি? সূক্ষ্ম নয়; সূক্ষ্ম অর্থ কি? স্থূল নয়।

---

* উপনিষদ বলিতেছেন;—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করিনা। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি, এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। 'আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে; এই বাক্যের মর্ম্ম, যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

ভাল অর্থ কি? মন্দ নয়; মন্দ অর্থ কি? ভাল নয়। এই সকল স্থলে একটীর জ্ঞানের সঙ্গে আর একটীর জ্ঞান জড়িত রহিয়াছে। ইংরেজী দর্শনে ইহাকে Co-relative ideas বলে। সেইরূপ, পরিমিত অর্থ কি? অনন্ত নয়। এই গেলাসটা পরিমিত পদার্থ। ইহার অর্থ কি? না, ইহা অসীম বা অনন্ত পদার্থ নহে। পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়।

অনন্তকে জানি এমন নহে, জানি না এমনও নহে। মনের প্রশস্ততা যত বৃদ্ধি হয়; জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার যত উন্নতি হয়, ততই মনুষ্য সেই অনন্তদেবকে ক্রমশঃ অধিকতর জানিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। তর্কচূড়ামণি দুইজন গাঁজা-খোরের গল্প করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, কাহারও টিকা ধরিবে না। কাহারও টিকা ধরিবে না? কি ভয়ানক কথা! আমি বলি সকলেরই টিকা ধরিবে। ভয় নাই, ভাবনা নাই! অনন্তের প্রদীপ নদীর পরপারে নাই। মানুষ! অনন্তের প্রদীপ তোমার অন্তরের অন্তরে জ্বলিতেছে!

তর্কচূড়ামণি বলিতেছেন,—"মনুষ্য কূপে ডুবিয়া এক পেট মাত্র জল গ্রহণ করিতে পারে; পুষ্করিণীতে ডুবিলেও এক পেট, নদীতে ডুবিলেও এক পেট, হ্রদে ডুবিলেও এক পেট,— সেই প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ সাগরে ডুবিলেও সেই এক পেট,—দুই পেট জল বা এক পেটের অতিরিক্ত এক বিন্দু জলও কেহ

---

* ইংরাজী শব্দে নিতে গেলে, আমরা অনন্তকে apprehend করিতে পারি, কিন্তু comprehend করিতে পারি না।

গ্রহণ করিতে পারিবে না।” কথাটার তাৎপর্য্য এই যে পরিমিত প্রতিমূর্ত্তির পূজা ছাড়িয়া অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে অধিক ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

একটা উপমাতেই আমরা ভুলিতে পারি না। শরীরের যেমন পেট আছে, আত্মার সেইরূপ পেট কি? আত্মার পেট, জ্ঞান ও ভাব। পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া শিক্ষিত যুবাকে বলিলেন,—“সূর্য্যদেবকে প্রণাম কর।” বল, “জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরং” শিক্ষিত যুবা বলিলেন, “সে কি? সূর্য্য কি দেবতা? বিজ্ঞান বলিতেছে, সূর্য্য জড় পদার্থ। সূর্য্য কি কি মূল পদার্থে গঠিত হইয়াছে, (Composition of the Sun) বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন।” আজ কালের মধ্যে যুবকগণ এসকল বিষয়ে পুরোহিত ঠাকুরের কথা শুনে না। কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের কথা শুনে। Father Lafont. তাঁহার বক্তৃতায় কি বলেন, তাহাই ভক্তি পূর্ব্বক শুনে। বিজ্ঞানের কথা সকলের উপর মান্য। বিজ্ঞান আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ নাইট্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত হইয়া বায়ুর উৎপত্তি হইতেছে; অমনি পবনদেব চম্পট্ দিলেন। বিজ্ঞান আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত হইয়া জলের সৃষ্টি করিতেছে। অমনি বরুণদেব প্রস্থান করিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা অন্ধকারেই থাকিতে ভাল বাসেন। যেখানে

বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হয়, সেখান হইতেই তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়েন। আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম বলিতেছে, "সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থকে দেবতা বলিয়া পূজা কর।" মার্জ্জিত জ্ঞান কি একথায় সায় দিতে পারে? প্রচলিত ধর্ম্ম কোন কোন বৃক্ষলতা, কোন কোন পশুপক্ষীকে পর্য্যন্ত দেবতা ভাবিয়া তাহাদের পূজা করিতে উপদেশ করে। মার্জ্জিত জ্ঞান কি সে উপদেশ গ্রহণ করিতে কখন প্রস্তুত হইতে পারে? জ্ঞানের সহিত প্রচলিত পৌত্তলিকতার সমন্বয় হওয়া যদি অসম্ভব হইল, তবে ভাবের যোগই বা কেমন করিয়া হইবে? জ্ঞান ও ভাব আত্মার পেট; সুতরাং পৌত্তলিকতা, আত্মার পেট কেমন করিয়া ভরাইবে? সত্যই আত্মার অন্ন; সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার পেট ভরে না। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।"

তর্কচূড়ামণি বলিয়াছেন,—"এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভগবান ত ভাবগ্রাহী তিনি ত সকলই বুঝিতেছেন, সকলই জানিতেছেন, আমার অন্তঃকরণ তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত ঐকান্তিক উৎকণ্ঠিত, তাহাওত তিনি জানেন, আমি যে মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ ধ্যানে অসমর্থ, তাহাও তিনি বুঝিতেছেন, তখন তিনি অবশ্যই আমার সেবা, আমার পূজা, আমার মিনতি গ্রহণ করিবেন।"

প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, ভগবানকে ভাবগ্রাহী বলা হইল কেন? দয়াময়, ইচ্ছাময়, শক্তিমান এ সকলত দূরের কথা, তাঁহাকে প্রভু পর্য্যন্ত বলিতে আপত্তি। তর্কচূড়ামণি বলিতে-

*ছেন,—"প্রভু ও ত বলিতে পারি না। প্রভু বলিলেও আমাদের পার্থিব ভাবই মনে আসে। যিনি দশ জন বা বিশজন বা ততোধিক লোকের উপর আপন ইচ্ছার প্রয়োগ করেন, প্রভু বলিলে আমরা তাঁহাকেই বুঝি। সুতরাং তাঁহার মধ্যেও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ক্রিয়ার ভাব নিহিত থাকিল। তবে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রভু বলিব?" "পার্থিব" ভাব মনে আসে বলিয়া এবং পার্থিব প্রভুত্বের মধ্যে "মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ভাব নিহিত" আছে বলিয়া যদি পরমেশ্বরকে প্রভু বলিতে আপত্তি হয়, তবে কোন্ যুক্তিতে তাঁহাকে "ভাবগ্রাহী" বলা হইল? 'ভাবগ্রাহিতা' কি পার্থিব ভাব নহে? ভাবগ্রাহীর মধ্যে কি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কার্য্য নাই?

আবার বলা হইতেছে,—"তিনি ত সকলই বুঝিয়াছেন, সকলই জানিতেছেন।" ঈশ্বর যদি বুঝিতেছেন ও জানিতেছেন তবে তাঁহাকে জ্ঞানময় বলিতে আপত্তি কেন? জ্ঞান বলিলে আমরা কি বুঝি? বুঝা ও জানা ছাড়া কি জ্ঞানের আর কোন অর্থ আছে?

---

* এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। তর্কচূড়ামণি বলিতেছেন যে, মূঢ়তাবশতঃ পরমেশ্বরের প্রকৃত-স্বরূপ ধ্যানে অসমর্থ হইয়া, যেরূপেই কেন তাঁহার পূজা ও সেবা করা হউক না, তিনি অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিবেন। যদি ঈশ্বরকে দয়াময় না বলেন, তবে কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিবেন? ঈশ্বর যদি আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর কিম্বা উদাসীন হন, তাহা হইলেও কি বলা যায় যে, তিনি অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিবেন? যদি নিষ্ঠুর বা উদাসীন না হন, তাহা হইলে দয়াময় বলা ভিন্ন

এক্ষণে প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক। সাকার উপাসকেরা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবেন না? রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এবিষয়ে যারপরনাই উদার মত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। আমরা কখন এমন বলিনা যে, নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি নর নারী সকলেই নরকগামী হইবে। মুক্তি কাহারও এক চেটিয়া নহে। কর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা; সেই পরিমাণে তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি মলিনচরিত্র, অভক্ত ও স্বার্থপর হয়, সে নামে ব্রাহ্ম হইলেও, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার সম্পর্ক অতি অল্প; মুক্তির রাজ্য হইতে সে বহুদূরে। আর সাকার-উপাসক হইয়াও যিনি

আর কি বলিবেন? কিন্তু কেমন করিয়াই বা দয়াময় বলিবেন? কুতর্ক-কণ্টকে যে, সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দয়াময় বলিবার পথ কোথায়?

তর্কচূড়ামণি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, স্তম্ভ, ভিত্তি, স্থূল পদার্থ; জ্ঞান, দয়া সূক্ষ্ম পদার্থ। পরমেশ্বরে যাহা আছে তাহা সূক্ষ্ম পদার্থ। অতএব তাঁহাকে স্তম্ভময়, ভিত্তিময় না বলিয়া, জ্ঞানময়, দয়াময় বলাই উচিত। চমৎকার যুক্তি! ঈর্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ; প্রেমও সূক্ষ্ম পদার্থ; অতএব একজন ঈর্ষান্বিত লোককে কি প্রেমিক বলিব? বৃক্ষ স্থূল পদার্থ, পর্ব্বতও স্থূল পদার্থ; অতএব বৃক্ষকে কি পর্ব্বত বলিব? যথার্থই যদি পরমেশ্বরকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, দয়াময় বলুন; নতুবা আর বৃথা ভান করিবেন না।

সরল, সত্যানুরাগী, প্রেমিক, পরোপকারী, ভক্তিমান্, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি রাজ্যের নিকটবর্ত্তী!

কিন্তু একটি কথা বিশেষ করিয়া বলি। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই; সত্য ভিন্নও মুক্তি নাই। অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে? মুক্তির মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, অপ্রেম, অপবিত্রতা, ও অসত্য এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে পৌত্তলিকতা লইয়া মনুষ্য কেমন করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে? পাপাসক্তির শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেইরূপ সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার, ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলেও মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কি উপায়ে তাহা হইবে? সদ্‌গুরু, সৎশাস্ত্র, ও ব্রহ্মকৃপা এই তিন উপায়।

অনেকেই বলেন যে, সাকার উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিবার ক্ষমতা ও অধিকার জন্মিবে। ইহা বিষম ভ্রম। মানবপ্রকৃতির একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বিষয় স্মরণ করিলে ঐ কথাটীর অযুক্ততা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সে নিয়মটীর নাম অভ্যাস। মানুষ যাহা পুনঃ পুনঃ করে, তাহাই করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; তাহাই করিতে তাহার ভাল লাগে। মানুষ যাহা করে না, তাহা করিবার ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। আবার যে কার্য্য করা, যে পরিমাণে অভ্যাস হইয়া যায়, তাহার বিপরীত কার্য্য করা সেই পরিমাণে কঠিন ও কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

অন্ধকারে বসিয়া থাকা যাহার অভ্যাস, আলোক তাহার সহ্য হয় না। যে পরিমাণে অন্ধকারে থাকা অভ্যাস হয়, সেই পরিমাণে আলোক অসহ্য হইতে থাকে। সাকার ও নিরাকার বিপরীত পদার্থ। সুতরাং যে পরিমাণে সাকার ধ্যান অভ্যাস হইয়া যায়, সেই পরিমাণে নিরাকার ধ্যান বিষয়ে অক্ষমতা জন্মে। *

এস্থলে একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, যদি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব কার্য্য হইত, তাহা হইলে মহর্ষিগণ সেপ্রকার উপাসনার উপদেশ কেন করিবেন? শাস্ত্রজ্ঞ-মাত্রেই অবগত আছেন যে, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্রেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে কি অসাধ্য সাধনের আদেশ রহিয়াছে? একজন রুগ্ন শরীর দুর্ব্বল ব্যক্তিকে আড়াই মণ বোঝা বহিতে অনুমতি করা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে? যাহা মনুষ্যের সাধ্য, মহর্ষিগণ তাহাই মনুষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন; অসম্ভব সাধনের উপদেশ দিয়া প্রতাবণা করেন নাই।

---

* লক্ষ লক্ষ সাকার উপাসকের জীবন প্রতিপন্ন করিতেছে যে, সাকার উপাসনা হইতেই নিরাকার উপাসনার শিক্ষা হয় না। তাঁহাদের বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য সাকার পূজাতেই কাটিয়া যায়; কখন নিরাকার উপাসনায় পৌঁছিতে পারেন না। যখন কেহ সাকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি অন্য প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াই তাহা করিতে পারেন। সাকার উপাসনা হইতেই সে জ্ঞান আসে না। সাকার উপাসনা দ্বারা মনুষ্যের মন নিরাকার উপাসনার উপযুক্ত হয় না। যত সাকার ভাবিবে, সাকার ভাবাই তত তোমার অভ্যাস হইবে, এবং তদ্বিপরীত নিরাকার ভাবা সেই পরিমাণে কঠিন হইয়া পড়িবে।

নিরাকার উপাসনা প্রতিপাদক শ্লোক শাস্ত্রে রাশি রাশি রহিয়াছে।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।
এতৎ তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ॥
অষ্টাবক্র সংহিতা ১ম প্রকরণ।

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান কর, এই পরম তত্ত্বের উপদেশের দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে আর সম্ভব হয় না।

মনসা কল্পিতামূর্ত্তি র্নৃণাঞ্চেৎ মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মনঃ কল্পিতমূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে মনুষ্যেরা স্বপ্নলব্ধ রাজ্যদ্বারা অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥
অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ড রতানরাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দ পরাঃ সুকৃতি নো নরাঃ॥
কুলার্ণব; ষষ্ঠ উল্লাস।

সাধকগণের হিতের নিমিত্ত চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও শরীরবিহীন পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। রূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া মনুষ্যেরা কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়াছে, আর পুণ্যবান মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ অমৃত ও আনন্দপরায়ণ হইয়া থাকেন।

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
নির্ম্মলং নিষ্কলং নিত্যং নির্গুণং ব্যোমসন্নিভং ॥
ইত্যাদি।

কুলার্ণব, তৃতীয় উল্লাস।

হে কুলেশ্বরি! পরব্রহ্মকে ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি নির্ম্মল, নিষ্কল, নিত্য, নির্গুণ, ব্যোমসন্নিভ।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে ॥

কুলার্ণব, নবম উল্লাস।

পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অন্য সকল নিয়মে কোন প্রয়োজন থাকে না; মলয় মারুত প্রাপ্ত হইলে তালবৃন্ত লইয়া কি কার্য্য?

কৃত্বা মূর্ত্তি পরিজ্ঞানং চেতনস্থ ন কিং কুরু।
নির্ব্বেদসমতা যুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥

অষ্টাবক্র সংহিতা; নবম প্রকরণ।

যিনি বৈরাগ্য ও সমতার যোগে সংসার হইতে নিস্তার করেন, সেই চৈতন্য-স্বরূপ, পরব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না।

উপেক্ষ্য তৎতীর্থ যাত্রাং জপাদীনেব কুর্ব্বতাং।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্যকরং লেঢ়ী তিস্থায় আপতেৎ ॥

পঞ্চদশী ধ্যানদীপ।

নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনাতে উপেক্ষা করিয়া যাহারা

তীর্থযাত্রা, জপ হোম প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহারা হস্তস্থিত খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ হস্তকেই লেহন করে।

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরংশান্তিং ন যান্তিতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত; তৃতীয়স্কন্ধ।

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা, প্রস্তর, তথা বর্ণ ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ়াৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।

একব্যাপীসমঃ শুদ্ধোনির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদি রহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥
সিতনীলাদি ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতেনভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥
বিষ্ণুপূরাণ, প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

পরমাত্মা এক এবং সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তমান, তিনি শুদ্ধ নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জন্ম নাই, এবং বৃদ্ধি নাই; সেই বিভু সকল স্থানে অব্যয়ভাবে প্রকাশিত আছেন। একমাত্র আকাশ যেমন শ্বেত, নীল বর্ণভেদে

ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রান্তদৃষ্টি মানবগণ পরমাত্মা এক হইলেও তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ পরমাত্মা এক এবং তিনিই সকলের আরাধ্য; ভ্রান্ত-বুদ্ধি মানবেরা তাঁহাকে ভিন্নভাবে দর্শন করিতে উদ্যত হইয়া অকৃতার্থ হয়।

হিন্দু হইয়া কে এই সকল ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন? সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে নিরাকার উপাসনা প্রতি-পাদক রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে। যে কয়েকটী শ্লোক প্রদর্শিত হইল; তাহার শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে সংশয় হইলে শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া দেখুন। যে অর্থ বলা হইল, উহাতেও সংশয় হইলে টীকা দেখুন। যে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার সাপক্ষে শ্লোক রহিয়াছে, একথা অনেকে হঠাৎ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব বলি শ্রীমদ্ভাগবত খুলিয়া দেখুন। যে অর্থ বলা হইল, তাহা প্রকৃত অর্থ কিনা, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে হইলে শ্রীধর-স্বামীকৃত টীকা দেখুন।

বেদের শিরোভূষণ উপনিষদ্ কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কেনোপনিষৎ।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে

মনন শক্তি দিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জান ; লোকে যে কোন জড় পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান অসম্ভব,' এই মতের সমর্থন জন্য তর্কচূড়ামণি উপনিষদুক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিযাছেন। কিন্তু শ্লোকটী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। সুতবাং উহার যে অংশ পৌত্তলিকতার *বিরোধী, সেই অংশটুকু বাদ দিয়া তৎস্থানে একটি ড্যাস্ দেওয়া হইয়াছে। সেই অংশটুকু কি আপনারা দেখিতেছেন ; "নেদং যদিদমুপাসতে" লোকে যাহার উপাসনা করে, সে ব্রহ্ম নহে।

শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিলে, নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনাই যে, সার ধর্ম্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিবেন না, যুক্তিও চাই।

---

* "নৈববাচা ন মনসা" প্রভৃতি যে শ্লোকটির কিয়দংশ তর্কচূড়ামণি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ঠিক পরের শ্লোকে কি আছে দেখুন ; "অস্তিত্যে বোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া যিনি ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে যথার্থরূপে প্রকাশিত হয়েন। এই অংশটুকু বলিলে তর্কচূড়ামণির মত খণ্ডিত হইয়া যায়। সুতরাং বলিবেন কেন ?

একজন ভট্টাচার্য্য রামমোহন রায়ের সঙ্গে শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ একটি শ্লোকের তিন চরণ বলিয়া চতুর্থ চরণটি ব্যক্ত করিলেন না। ব্যক্ত করিলে তাঁহার নিজের মত খণ্ডিত হয়। রামমোহন রায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "মহাশয়! তিনটি চরণ দেখাইয়া চতুর্থ চরণটি ঢাকিলেন কেন ?"

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু-ধর্ম্মের সার। উহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। যে মনে করে যে, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয়, তাহার তুল্য ভ্রান্ত কে আছে? নিরাকার উপাসক বলিয়া অহিন্দু মনে করিয়া যদি আমাকে ঘৃণা কর, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। যদিও আমি নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক, যদিও আমি জাতিভেদ অস্বীকার পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি, যদিও আমি হিন্দু সমাজে বালিকা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ও তদ্বিষয়ে উদ্যোগী, যদিও আমি বাল্যবিবাহ রূপ রাক্ষসীর বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর, তথাচ কাহারও অধিকার নাই যে, আমাকে অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করেন। ঐ সকল মতের প্রত্যেক মত হিন্দু শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে। অহিন্দু বল, আর যাহাই কেন বলনা, সেকথা গ্রাহ্য করি না।

আর একটি কথা। যে সাংখ্য দর্শনের কথা বলিয়া তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় সে দিবস আলবর্ট হলে অনেককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাংখ্য দর্শনের একটি সূত্র "ঈশ্বরা সিদ্ধে",—ঈশ্বর অসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীতে অগস্ত কমট্ যে মত প্রচার করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতে সেই মত প্রচার করিয়া সাংখ্য দর্শন যদি হিন্দু দর্শন বলিয়া গণ্য হইতে

পারে, তবে জিজ্ঞাসা করি বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া, কোন্ যুক্তিতে, কোন্ বিচারে আমি অহিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইব? (উচ্চ করতালি)

আমি একবার বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলাম। সেখানকার আর্য্য সমাজে মহাত্মা দয়ানন্দের একটি বক্তৃতা শ্রবন করিলাম। দয়ানন্দ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—অতি প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ নিরাকার, সর্ব্বগত, পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদেরই সন্তানগণ বলিতেছেন যে, নিরাকারকে ভাবা যায় না। ইহা গৌরবের কথা নয়, লজ্জার কথা।

বাস্তবিক যখন সমুদয় পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণ সেই নিরাকার, অগম্য, অতীন্দ্রিয়, জগতের প্রাণ পরমেশ্বরকে "করতলন্যস্ত আমলকের" ন্যায় অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ধিক্ থাক্ আমাদিগকে, যে আমরা সেই সকল মহাপুরুষদিগের সন্তান পরম্পরা হইয়া এখন বলিতেছি যে, নিরাকারকে ভাবা যায় না। (উচ্চকরতালি)

আমাদিগকে ধিক্ ধিক্ শতধিক্। নিরাকার উপাসনায় অক্ষম বলিয়া গৌরব কবিবার কোন কাবণ নাই। উহা আমাদের আধ্যাত্মিক অধোগতির অবশ্যম্ভাবী ফল। গৌরব করিওনা—গৌরব করিবার কোন কারণ নাই; অধোগতির জন্য অনুতাপিত হও; উন্নত হও; পবিত্র হও; পিতৃপুরুষদিগের পূজিত বিশ্বকারণ, বিশ্বের প্রাণ, নিরাকার পূর্ণ

ব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হও। তাঁহার পূজাতেই আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল; তাঁহার পূজাতেই দুর্ভাগ্য ভারতের মঙ্গল।।

ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন।

অদ্যকার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পবিত্র স্বরূপ, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। তৎপর সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীকে সমাদরের সহিত নমস্কার করি।

ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে কতক্গুলি কথা বলিবার জন্য পুনর্ব্বার আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার বক্তৃতা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, গতবার ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত কতক্গুলি ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করাই আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। অদ্যকার উদ্দেশ্য কিছু ভিন্ন। ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে যে সকল

---

* হিন্দুশাস্ত্র যে পুনরঃকার ব্রহ্মোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, ও মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার জন্য, বক্তৃতার শেষভাগে. বক্তা তাঁহার সংস্কৃতানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গকে নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করেন;—(১) রাজা রামমোহন রায়ের বিচার পুস্তক; (২) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" (৩) বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি প্রণীত ভ্রম-বিনাশ।

আপত্তি সচরাচর শ্রুত হওয়া যায়, সেই সকলের অসারত্ব প্রদর্শন করাই অদ্যকার বক্তৃতাব উদ্দেশ্য।

আর একটি কথা। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে আলোচনা যত অধিক হয়ঃ ততই ভাল। পরমেশ্বরের উপাসনা ধর্ম্মের মূল; পরমেশ্বরের উপাসনায় আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল, পরমেশ্বরের উপাসনায় দুর্ভাগ্য ভারতের মঙ্গল। যে দিন আমাদের কৃতবিদ্য যুবকগণ বিশ্বাস ও ভক্তিব সহিত সকলে সেই অগম্য, অপার, অশরীরী পরব্রহ্মের পূজা করিবেন, সেই দিন ভারতের দুঃখ রজনীর প্রভাততারা দৃষ্ট হইবে। যে দিন দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত, "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের জয় পতাকা উড্ডীন হইবে, যে দিন আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্য পিতৃপুরুষদিগেব পূজিত পরব্রহ্মের পবিত্র সিংহাসন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে,—সেই পরম দেবতা আমাদের প্রতি গৃহের গৃহ দেবতা হইবেন,—যেদিন ভারতের সর্ব্বত্র পবিত্র ব্রহ্মসংকীর্ত্তনে আকাশ প্রতিধ্বনিত ও পবিত্রীকৃত হইবে, যে দিন ভারতবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয় হইতে তাঁহার চরণে প্রেম ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইবে, সেই দিন, সেই আনন্দময় শুভদিনের কথা মনে হইলেও আনন্দ হয়। সেই শুভদিনে ভারতবাসী বহুকালের দুশ্চিকিৎস্য রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আরাম লাভ করিতে থাকিবে। তাই বলি, ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে আলোচনা যত হয়, ততই মঙ্গল।

নিরাকারের ভাবনা।

ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি সেদিন খণ্ডিত হইয়াছে। আপত্তিটী এই যে, মানুষ নিরাকার চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না। একথা যে নিতান্ত অযুক্ত ও অসার, সে দিবস তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু না বলিলেও চলিত।

কিন্তু নিরাকার ভাবনা বুঝাইবার জন্য আমি যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম যে, মানুষের মন, মনের ভাব সকল;—সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতি নিরাকার; এই সকল নিরাকার ভাবকে মনুষ্য মাত্রেই অনুভব করিতেছে; তবে নিরকার পরমেশ্বরের ভাবনা ও উপাসনা হইবে না কেন?

একথার বিরুদ্ধে একটি ভয়ানক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে—"কে বলিল মন ও মনের ভাব সকল নিরাকার? কে বলিল সুখ দুঃখ, প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা সকল নিরাকার? এসকলই সাকাব। মন সাকার; মানসিক ভাব সকল সাকার; সুখ দুঃখ, প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি সকলই সাকার।"

মন ও মানসিক ভাব, সুখ, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি সাকার? মনকে কি কখন হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়াছেন? এক ব্যক্তি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার মনটা এত মন্দ যে

মনের যদি আকার থাকিত, তাহা হইলে মনের দুই গালে দুই চড় লাগাইতাম।" অনেকেই সময়ে সময়ে মনের উপর এতদূর বিরক্ত হন যে, মন বেচারার আকার থাকিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না।

আকার বলিলেই একটি প্রশ্ন আসে,—কি আকার? গোল, ত্রিকোণ, না চতুষ্কোণ? আকাব থাকিলে তাহা অবশ্য কেহ চক্ষে দেখিয়াছেন বা হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করি কি আকার? কোন ব্যক্তি এরূপ বলেন যে সুখ দুঃখ, প্রেম প্রভৃতিকে যখন অল্প ও অধিক বলা হইতেছে তখন ও সকল অবশ্যই সাকার। এস্থলে একটি চমৎকার যুক্তি আছে; যুক্তিটী এই;—অল্প ও অধিক শব্দ যখন সাকার পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, তখন সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধে উহা ব্যবহৃত হইলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সুখ দুঃখ প্রভৃতি সাকার। এই সহজ কথাটা কি আবাব বুঝাইতে হইবে? অল্পাধিক শব্দ যখন জড় বা সাকার পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার হয়, তখন তাহা পদার্থের বিস্তৃতির অল্পাধিক্য প্রকাশ করে। দৈর্ঘ্যে কত? প্রস্থে কত? বেধ কত? ইহাই প্রকাশ করে। অথবা ওজনে কত, তাহাও প্রকাশ করে। কয় মণ? কয় সের? কয় ছটাক? ইহাই প্রকাশ করে।

জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি হাতকাটি লইয়া মাপিয়া দেখিয়াছেন যে মন কয় হাত, কয় আঙ্গুল? নিজ নিজ সুখ দুঃখের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কিরূপ? অথবা জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি আপনার মনকে,—সুখ দুঃখ, প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি মান-

সিক ভাব সকলকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন? কত সের, কত ছটাক সুখ? কত সের কত ছটাক দুঃখ? কত সের, কত ছটাক ভালবাসা? বাস্তবিক অল্প ও অধিক শব্দ সাকার পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে অনুভূতি বুঝায়। একস্থলে বিস্তৃতির পরিমাণ আর একস্থলে অনুভূতির পরিমাণ। দুই স্থলেই এক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া কি দুই বিপরীত পদার্থ এক হইয়া যাইবে? মন সাকার, সুখ দুঃখ সাকার, এসকল কথা অবোধ বালকের মুখেই শোভা পায়, প্রাপ্তবয়স্ক এক ব্যক্তি এমন কথা কেমন করিয়া বলিতে পারে?

কেহ কেহ বলেন, "কেন? মনের আকার নাই? মন তো মস্তিষ্ক"। একজন বলিল,—"আমার মনে কষ্ট হইয়াছে।" আর একজন বলিল "আমার মস্তিষ্কে কষ্ট হইয়াছে।" এ দুই কথার কি একই অর্থ? পুত্র বিয়োগে কষ্ট পাইলে তাহাকে মস্তিষ্কের কষ্ট বলা যায় না। আবার শিরোবেদনা হইলে লোকে সচরাচর তাহাকে মনের কষ্ট বলে না। তবে মন মস্তিষ্ক নয়,—সেতারের তার, সুর ও রাগ রাগিণী নয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইমন কল্যাণ রাগিণী কেমন? তাঁহাকে সেতারের পিত্তলের তার দেখাইলে কেমন হয়? বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র,—মন নহে।

মস্তিষ্কই মন? এতো ঘোর নাস্তিক জড়বাদীদিগের কথা! হায়! হায়! সাকার উপাসনা বজায় রাখিবার জন্ত শেষ নাস্তিক জড়বাদের শরণাপন্ন হইতে হইল! সাকার উপাসনা

বজায় রাখিবার জন্য, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, নাস্তিকতাবাদ, অনেক বিসম্বাদ ঘটাইতে হইতেছে! হায়! হিন্দুধর্ম্ম! তোমায় শেষ এই দশা হইল!

সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে আর একটি কথা। জড় পদার্থের যে সকল গুণ আছে, মন ও মানসিক ভাব নিচয়ে তাহা নাই। প্রত্যুত: এ উভয় সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ বিশিষ্ট। জড়ের বিপরীত গুণ মনে, মনের বিপরীত গুণ জড়ে। আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ জড়ের গুণ; চিন্তা, ভাব, ও ইচ্ছা মনের গুণ। জড়ে যাহা দেখিতেছি; মনে তাহা দেখিতেছি না,—বিপরীত গুণবিশিষ্ট দেখিতেছি; তবে এ দুইকে কেমন করিয়া এক শ্রেণীভুক্ত বলিব?

যদি মন ও মানসিক ভাব নিচয়কে,—সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতিকে সাকার বল; তবে ইষ্টক, প্রস্তর, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী সমূদ্রকে নিরাকার কেন বল না? যদি মনের ভাব সকলকে সাকার বলিতে পারি, তবে কলিকাতা নগরের এই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকাকে নিরাকার কেন বলিব না? এই সুপ্রশস্ত গৃহটি কি? অবশ্য নিরাকার। এক দিকে যেমন যুক্তি অপর দিকেও তেমনি যুক্তি।

কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাকারের কোন জ্ঞান নাই। একি কথা! নিরাকারের জ্ঞান, অভাবাত্মকজ্ঞান, (negative idea) নিশ্চয়ই আছে। সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারের অভাবাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে। নিরাকার কি? না যাহা সাকার নহে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন

যে আমরা নিরাকার ভাবি, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। নিরাকার আবার ভাবিব কি? আকার নাই, আকার নাই,' এই কি একটা ভাবিবার বিষয়? হাত, পা, নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ভাবিলে ঈশ্বরকে ভাবা হয় না। আবার, হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, নাসিকা নাই, এরূপ ভাবিলেও ঈশ্বরচিন্তা হয় না। তবে কি ভাবিব? শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়, অনন্ত পরমেশ্বরকেই ভাবিব।

নিরাকারের উপাসনা প্রত্যক্ষ সত্য।

একটি কথা বিশেষ করিয়া বলি। কাহারও সাধ্য নাই প্রমাণ করেন যে, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। কিন্তু সে উপাসনা যে কেমন, সে উপাসনায় যে আত্মাতে কি ভাব হয়, তাহাতে যে কি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, তাহা না করিলে কেমন করিয়া বুঝিবে? যাহার সাধন নাই, ভজন নাই, ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে কথা কওয়া তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। না পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া সহজ। কিন্তু পরিশ্রম পূর্ব্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হওয়া কঠিন কার্য্য।

যে কখন চিনি খায় নাই, সে বলিতে পারে চিনি তিক্ত। আমি বলিব সে কি! আমি যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি চিনি মিষ্ট। সে ব্যক্তি বলিবে, "তাহা বলিলে কি চলে; চিনি নিশ্চয়ই তিক্ত; আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারি চিনি তিক্ত।" এ কথায় আমি কি বলিব?

বলিব ভাই, আমি তর্ক জানিনা। তোমার জিহ্বায় একটু চিনি লাগাইয়া দি; দেখদেখি, চিনি তিক্ত কি মিষ্ট।

আবার বলি, সাধন চাই, ভজন চাই। সাধন ভজন ভিন্ন কখনই বুঝিতে পারিবে না, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা কেমন। কেবল তর্ক করিয়া বুঝা যায় না, কেবল বক্তৃতা করিয়াও বুঝা যায় না। আমরা চক্ষু মুদিয়া কেবল অন্ধকার দেখি? কেবল অন্ধকার দেখিবার লোভে দুই ঘণ্টা বা সমস্ত দিন ঐ ভাবে বসিয়া থাকি!

যাহাব সাধন ভজন নাই, সে ব্যক্তি চক্ষু মুদিয়া নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবিতে গিয়া "ধুঁয়া ধুঁয়া" দেখিবে না তো আর কি দেখিবে? তার পর, অপূর্ব্ব অদ্ভুত যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিবেন, "আমি যখন ধুঁয়া ধুঁয়া দেখিতেছি, তখন জগতের যত লোক নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে, সকলেই ধুঁয়া ধুঁয়া দেখে।" শিক্ষিত যুবকগণ! আপনারা জানেন যে, insufficient data হইতে সিদ্ধান্ত করিলে তাহা ভুল সিদ্ধান্ত হয়। তবে বলুন দেখি, নিজের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিরূপ তর্ক শাস্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত?

একজন লোকের নেবা হইয়া সকল পদার্থ হরিদ্রাবর্ণ বোধ হইতেছে। সেই ব্যক্তি যদি তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে যে, জগতের সকল পদার্থই হরিদ্রাবর্ণ; অথবা সকলেই তাহার মত সকল পদার্থকে হরিদ্রাবর্ণ দেখিতেছে, তাহা হইলে উহা যেমন যুক্তি, নিজে ধ্যান করিতে গিয়া "ধুঁয়া ধুঁয়া" দেখিয়া

সিদ্ধান্ত করা যে, অপর সকলেই "ধুঁয়া ধুঁয়া" দেখিতেছে, ইহাও সেইরূপ যুক্তি!

অন্ন গ্রহণ করিয়া আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। তুমি যদি বল, "না; তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই; অন্নের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার শক্তি নাই", তাহা হইলে আমি কি বলিতে পারি? আহার করিয়া আমি পরিতোষ লাভ করিলাম, তোমার তর্কে কি হইবে? তুমি হয়তো বলিবে, "বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রতিপন্ন করিতে পারি, যে অন্ন গ্রহণ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।" বৈজ্ঞানিক প্রমাণ জানি না; কিন্তু প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নাই।

নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবা যায় না? অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে ধ্যানে পাওয়া যায় না? এমন কথা যে বলে সে অন্ধ। হায়! আর্য্যসন্তান হইয়া লোকে এমন কথা বলিতেছে! হে পূজ্যপাদ আর্য্য পিতৃপুরুষগণ! হে তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ! যখন সমুদয় জগৎ জড়োপাসনা ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তোমরা সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলে; অধ্যাত্মযোগে সেই অরূপ পরমব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলে; এখন তোমাদেরই পবিত্র বংশোদ্ভব সন্তানগণের এমনি শোচনীয় অবস্থা—এমনি দুর্গতি, তাহাদের চিত্ত এমনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যে তোমাদের পূজিত সেই অজড়, অতীন্দ্রিয়, চিন্ময় পুরুষের ধ্যানে আর তাহাদের সামর্থ্য নাই; উহা সম্ভব বলিয়াও তাহারা মনে করিতে পারিতেছেনা।

প্রাচীনকালের ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণের কথা তো দূরের কথা। এখনই কি আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক দৃষ্ট হন না, যাঁহারা সেই নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মে আপনাদের আত্মাকে এমনি ভাবে সমর্পিত করেন যে, এ সংসারের তরঙ্গ আর তাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না? আমরা কি দেখি নাই যে, আমাদের একজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও, সকল প্রকার সাংসারিক সুখ-ভোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পবিত্র হিমাচলের নির্জ্জন-তায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন? উপযুক্ত প্রিয় পুত্রের বিয়োগ হইল, তিনি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া সকল ভুলিলেন, তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু শোকাশ্রু নিঃসৃত হইল না।

আমরা কি দেখি নাই যে, আমাদেরই একজন বন্ধু, সামান্য অবস্থার লোক হইয়া, দরিদ্রতার কশাঘাৎ পৃষ্ঠে সহ্য করিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিবারের বিষম ভার গলায় বাঁধিয়া, কেমন করিয়া সত্য প্রচার করিয়াছেন, কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া বিশ্ব-সংসারকে বিস্মৃত হইয়াছেন? এমনি ধ্যানে মগ্ন যে, কোথা দিয়া দিন রাত্রি চলিয়া যাই-তেছে সে জ্ঞান নাই। সেই সাধু পুরুষ এখন মৃত্যু-নদীর পর-পারে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া অধ্যাত্মযোগ দ্বারা বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্মকে মনুষ্য আপনার আত্মায় আয়ত্ত করিতে পারে; কেমন করিয়া সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-

পত্তিকে আপনার পর্ণকুটীরে আনিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত কি কখন ভুলিতে পারি?

এখনও কি আমাদের মধ্যে এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু নাই যে, ব্রহ্মধ্যানে তাঁহার হৃদয়-মন এমনি মগ্ন হইয়া যায় যে, যে সূর্য্য উদয় হইল, সে সূর্য্য অস্ত গেল, আবার উদয় হইল, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না!

আর একজন বিশ্বাসীর জলন্ত পবিত্রমূর্ত্তি এখনই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান। প্রাণের দুহিতা, প্রাণের পুত্রকে যম কাড়িয়া লইল; তিনি কি বলিলেন? "ভগবান যাহা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন; তিনি কখন মন্দ করেন না।" এই বলিয়া শোককে দূরে নিক্ষেপ করিলেন;— মানবাত্মা যে নিরাকার পরমেশ্বরে সাকারের অপেক্ষাও অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, অবিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিলেন।

আমাদের মধ্যে যে সকল ভগবদ্ভক্ত সাধু সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত কখনও ভুলিতে পারি না। কিন্তু অন্যের কথায় কাজ কি? বল, হে ব্রহ্মোপাসকগণ! সেই অগম্য ব্রহ্মের উজ্জ্বলসত্তা তোমাদের নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া কি কখনও সংসারের শোক তাপ বিস্মৃত হও নাই? বল, হে ব্রহ্মোপাসকগণ! কখন কি সেই অনন্ত অমৃত-সাগরে মগ্ন হইয়া প্রাণ মন শীতল কর নাই? নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে যে প্রত্যক্ষ অনুভব

করা যায়, তোমাদের হৃদয়, মন, প্রাণ কি শতকণ্ঠে এই সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে না? (উচ্চ করতালি)

দুঃখের অন্ধকার চারিদিক্ ঘেরিল, একটীও আশার রশ্মি প্রকাশিত হয় না, কোন বন্ধুর সহাস্য বদন আমার মুহ্যমান হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করে না, তখন কি করিলাম? বলিলাম, "হে জগদীশ্বর! হে প্রভো! তোমা ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। তুমি নিরাশের আশা হও, তুমি আমার অন্ধকারের আলোক হও। রক্ষা কর, প্রভো, রক্ষা কর"। যখন প্রাণের ভিতর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিলাম, তখন যথার্থই আমার প্রাণের দুঃখ দূরে পলায়ন করিল, যথার্থই আমি গভীর যন্ত্রণায় সান্ত্বনা পাইলাম, যথার্থই, বাক্যমনের অগোচর পরম পুরুষকে অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। (একটি ধ্বনি,—"বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর"।)

জীবনের পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, তাহা কি ভুলিতে পারি? প্রত্যক্ষের তুল্য প্রমাণ নাই; প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের মূল। যাহা জীবনের কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার নিকটে সকল প্রকার যুক্তি তর্ক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বিদ্রূপ করিতে হয়, কর, কিন্তু ভগবান্ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। বিদ্রূপকে ভয় করি না; গ্রাহ্য করি না।

পরমেশ্বরকে কি দেখা যায়?

অনেকেই পরমেশ্বরকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন। চর্ম্মচক্ষে না দেখিলে, তাঁহাকে দেখা হয় না, ইহাই লোকের

মনের ভাব। এই প্রকার মানসিক অবস্থা, অনেক পরিমাণে প্রচলিত পৌত্তলিকতাকে পোষিত করিতেছে।

আসল ঈশ্বরকে না পাইয়া একটা মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে তৃপ্তি লাভ করিতে যত্ন করিতেছে। এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব জানিয়া, আশা করিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে গিয়া তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। লোকের এই প্রকার মানসিক ভাব লক্ষ্য করিয়াই রাজা রামমোহন রায় গান রচনা করিয়াছিলেন, "মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।"

পরমেশ্বরকে দেখা তো দূরের কথা; হে চাক্ষুষ দর্শন প্রার্থি! মানুষকে কি কখন দেখিয়াছ? মানুষ কি? এই হাত, পা, নাক, কান, মুখ প্রভৃতি কি মানুষ? এই অস্থি ও মাংসপিণ্ড কি মানুষ? তাহা যদি না হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, মানুষকে কি কখনও দেখিয়াছ?

জগতের কোন মানুষকে কি কখন দেখিয়াছ? তোমার স্বদেশবাসী, গ্রামবাসী, প্রতিবাসী, আত্মীয় স্বজন কাহাকেও কখন কি দেখিয়াছ? তোমার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও কখন কি দেখিয়াছ?

কোন মানুষ কখন কোন মানুষকে দেখে নাই। এই যে আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেছি, আপনারা কি আমাকে দেখিতে পাইতেছেন? আপনারা কতকগুলি শব্দ শুনিতেছেন, এবং জড়পদার্থ এই শরীরটা

দেখিতেছেন। আপনারা আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না, আমিও আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ দেখিলেই কি মানুষ দেখা হয়? মাংসপিণ্ড দেখিলেই কি মানুষ দেখা হয়?

বিদেশে রহিয়াছি, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, আমার মাতা-ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া। অমনি ব্যস্ত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে বাড়ী আসিলাম। মা মা বলিয়া ডাকিলাম; মা কোথায়? মা কোথায়? কে আর উত্তর দিবে? পরিবারগণ কাঁদিতেছে, মাতার মৃতশরীর গৃহ-প্রাঙ্গণে শয়ান। বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বলিলাম, "হায়! মার সঙ্গে দেখা হইল না"!

দেখা হইল না কেন? কি এমন ছিল, যাহা এখন নাই? পূর্ব্বে এমন কি দেখিতাম, যাহা এখন দেখিতে পাইতেছি না? সেই হস্তপদ, সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাসিকা, সেই সকলই দেখিতেছি। তবে কেন বলি "হায়! দেখা হইল না"?

দেখা অর্থে যদি চক্ষে দেখা হয়, তাহা হইলে চিরদিন যাহা দেখিয়াছি, এখনও তাহা দেখিতেছি। কিন্তু চক্ষে দেখা ভিন্ন কি আর কোন রূপ দেখা নাই? তবে কেন বলি, "হায়! মার সঙ্গে দেখা হইল না!" শারীরিক চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত এতদিন যে অশরীরী, জ্ঞানময়ী, স্নেহময়ী মাকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে শারীরিক চক্ষে কেমন করিয়া দেখিব? শারীরিক চক্ষু যেমন সেই মাতার মাতা, স্বর্গীয়

অনন্ত মাতাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ এই পরিমিত পার্থিব মাতাকেও দেখিতে পায়না; মাতা কি পিতা; ভ্রাতা কি ভগিনী; প্রতিবাসী কি গ্রামবাসী; স্বদেশবাসী কি বিদেশবাসী কোন মনুষ্যকে দেখিতে পায় না। জ্ঞান জ্ঞানকে দেখে, প্রেম প্রেমকে দেখে, সংক্ষেপতঃ আত্মা আত্মাকে দেখে। নিরাকার দর্শন কেবল পরব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়, মানুষ যে মানুষকে দেখিতেছে, ইহাও নিরাকার দর্শন। যে ব্যক্তি মনে করে যে, সাকার দর্শনই মানুষের সর্ব্বস্ব, তার তুল্য ভ্রান্ত আর কে?

নিরাকারের চরণ।

এখন আর একটি গুরুতর আপত্তির আলোচনা করিতে হইবে। অনেক সাকার-উপাসক বলেন, "তোমারা মুখে বল, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করি, কিন্তু বাস্তবিক তোমরা মনে মনে সাকার উপাসনা করিয়া থাক। কেন? এ প্রকার করিবার প্রয়োজন কি? লোকের নিকট নিন্দিত, ঘৃণিত ও অত্যাচারিত হইবার লোভে আমরা এই কপটতা করি? আপত্তিকারীগণ, কি আমাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমরা যথার্থই সাকার উপাসনা করিয়া থাকি?

যাঁহারা এরূপ গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন, তাঁহাদের অখণ্ড যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে; "যখন তোমরা ঈশ্বরের চরণ, ঈশ্বরের মুখ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেছ, তখন

তোমরা অবশ্য একটা মূর্ত্তি চিন্তা কর। মুখে বলিতেছ 'চরণ', 'মুখ', অথচ মনে ভাবিতেছ নিরাকার, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? একজন বলিয়াছেন, "যখন চরণ শব্দ বল, তখন মনেও অবশ্য চরণ ভাব। নতুবা বলিতেছ চরণ, ভাবিতেছ কি কুমড়া?"

আমরা যখন পরমেশ্বর সম্বন্ধে চরণ মুখ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, তখন যে উহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই সহজ কথাটাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? মানব প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ কবিত্ব রহিয়াছে। মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও স্বভাবতঃ তাহার মুখ হইতে রূপক শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যে কবিত্ব মনুষ্যসাধারণের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাহা অধিকতর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইঁহারাই কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরাই কেবল রূপক শব্দ ব্যবহার করি, এমন নয়। প্রাচীন মহর্ষিগণও সেইরূপ করিয়াছেন। নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন, উপনিষদ্ সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও, ব্রহ্মস্বরূপ বলিতে গিয়া, তাঁহাকে,

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো-
ঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবা-
গমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্ ॥"

* তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ; অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক প্রাণ বিহীন, কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

বলিয়া বর্ণনা করিলেও, আবার স্থানে স্থানে আমাদের মত রূপক শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়াছেন। একস্থলে বলিতেছেন,—
"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।"
সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। নিরাকার ব্রহ্ম অথবা নিরাকার মন সম্বন্ধে চক্ষু প্রভৃতি শারীরিক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ-বাচক শব্দের রূপক ব্যবহার মনুষ্যের পক্ষে যারপরনাই স্বাভাবিক। সেই জন্যই কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান সময়ে নিরাকার ব্রহ্মসাধকদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেবল যে, ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা বা ভক্তির উদ্দীপক স্তোত্র প্রার্থনাদিতে ঐ প্রকার শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, এমন নহে; সাধারণ সাহিত্য মধ্যে ঐ প্রকার ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল সাহিত্য কেন? সামান্য পত্রাদি রচনাতেও ঐরূপ রূপক প্রয়োগ প্রচলিত।

দু একটি সামান্য সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একজন পত্রে লিখিলেন, "শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।" এখানে দেখুন, চরণ শব্দের অর্থ কি? লেখক কিসের নিকট নিবেদন করিতেছেন? মুখের নিকট? চক্ষের নিকট? নাকের নিকট? হাতের নিকট? না, মনুষ্যদেহের নিম্নতম অঙ্গ চরণের নিকট? সকলেই বলিবেন, চক্ষু কর্ণ, মুখ, নাসিকা হস্ত পদ প্রভৃতি কোন শারীরিক ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের নিকট নিবেদন করা হইতেছে না, মনুষ্য বিশেষের নিকটেই নিবেদন করা হইতেছে।

পত্রাদিতে চরণ শব্দ লিখিলে যথার্থই চরণ বুঝিতে হইবে কোন্ বাতুল এমন কথা বলিবে? যাঁহারা বলেন, চরণ শব্দের অর্থ চরণ, অর্থাৎ শারীরিক অঙ্গ বিশেষকেই বুঝিতে হয়, তাঁহাদের মতানুসারে চলিতে হইলে, যে পত্রের শিরোনামায় 'শ্রীচরণেষু' লেখা থাকে, ডাক হরকরার কখন উচিত নয় যে, তাহা যে ব্যক্তির পত্র তাহার হাতে দেয়। যখন স্পষ্ট 'শ্রীচরণেষু' লেখা রহিয়াছে, তখন পত্রখানি সে ব্যক্তির হাতে না দিয়া, তাহার পায়ে গুঁজিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

একজনের পিতার চরণে ক্ষত হইল। ক্রমশঃই ক্ষত বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ভয়ানক ঘোর হইয়া উঠিল। ডাক্তর বলিলেন চরণ দুখানি না কাটিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। অগত্যা উহা amputate করা হইল। তাঁহার পুত্র কোন কারণে বিদেশস্থ হইলেন। সেখান হইতে পিতা ঠাকুর মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিবেন। কিন্তু পত্রের শিরোনামায় কি লিখিবেন? পূর্ব্বের ন্যায় কি শ্রীচরণ কমলেষু লিখিবেন? পিতৃভক্ত পুত্র ধ্যানে বসিলেন; দেখিলেন পিতার মুখ আছে, কর্ণ আছে, নাসিকা আছে, হস্ত আছে, বক্ষঃস্থল আছে, উদর আছে, কেবল চরণ যুগল ধ্যানে পাইলেন না। ডাক্তরের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সে দুটিকে অদৃশ্য করিয়াছে। পুত্র এখন করেন কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলেন, "শ্রীহস্তেষু।" পিতাঠাকুর মহাশয় চটিলেন। দেখা হইলে পুত্রকে বলিলেন, "বাপু হে! আমাকে এমন অপমান করিলে

কেন ?” পুত্র বলিলেন, “বাবা ! মিথ্যা কথা কেমন করিয়া বলি ?”

যখন পরমেশ্বর সম্বন্ধে চরণ শব্দ ব্যবহার হয়, তখন তাহার অর্থ কি ? চরণ শব্দে কোন স্থানে আশ্রয় বুঝায়। যদি বলি, “হে প্রভো ! আমাকে তোমার চরণ দেও !” এস্থলে চরণ অর্থ আশ্রয়। কোন কোন স্থলে বিশেষ একটা কোন অর্থ বুঝায় না ; কেবল বিনীতভাব প্রকাশ করে ; কেবল আপনাকে ছোট করা হয়। অনেক স্থলে উক্ত শব্দে ভক্তিভাব প্রকাশ হয় মাত্র।

ব্রহ্মোপাসনা কি আধুনিক ধর্ম্ম।

অনেকে মনে করেন যে, নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা আমাদের দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম নহে ; উহা এক প্রকার বিলাতী মত। সুতরাং উহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে।

বাস্তবিক কি ব্রহ্মোপাসনা নূতন মত ? শাস্ত্রজ্ঞ জানেন যে, ইহার তুল্য ভুল কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু যদিই বা ইহা নূতন মত হয়, তাহাতেই বা কি ? প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া কি অসত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সত্যকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে ? প্রাচীন কি আধুনিক সে বিচার করিতে চাই না ; সত্য কি অসত্য তাহাই দেখিতে চাই। যদিও বা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়া থাকে, যদিও বা বেদবেদান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে, তথাচ

যাহা অসত্য, তাহা চিরদিনই পরিত্যজ্য; এবং যদিও বা এই মুহূর্ত্তে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, যদিও বা অতি সামান্য লোকে সামান্য ভাষায় তাহা প্রচারিত করে, তথাচ সত্য চিরদিনই শ্রদ্ধা ও আদরের পদার্থ;—চিরদিনই শিরোধার্য্য।

সত্য গ্রহণ করিবার সময়, প্রাচীন কি আধুনিক, যেমন বিচার করিব না, সেইরূপ দেশীয় কি বিদেশীয় তাহাও দেখিব না। দেশীয় বলিয়া কি অসত্যকে আলিঙ্গন করিতে হইবে? আবার বিদেশীয় বলিয়াই কি সত্যকে পদতলে বিদলিত করিতে হইবে? "ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিব না, ম্লেচ্ছ গ্রন্থ পড়িব না" এমন কথা যে বলে তাহার তুল্য ভ্রান্ত আর কে? প্রাচীন কি আধুনিক, ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষীয়, সত্য সম্বন্ধে এ সকল বিচার করা সঙ্কীর্ণ-হৃদয় নির্ব্বোধের কার্য্য। যে সময় বা যে স্থান হইতেই সত্য আসুক না কেন, উহা সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র চরণারবিন্দ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক কি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা আধুনিক ব্যাপার? বাস্তবিক কি ইহা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে, এই পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর মাত্র প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে? বাস্তবিক কি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সেই অগম্য অপার অতীন্দ্রিয় বিশ্ব-কারণের উপাসনার কথা কিছু উল্লিখিত নাই? এমন কথা যে ব্যক্তি বলে, সে হয় আর্য্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্তই মূর্খ; নয়, সে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির অভি-প্রায়ে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গোপন করিয়া অনভিজ্ঞ লোককে প্রতারিত করে।

যে বলে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা আধুনিক ব্যাপার, সে কেবল আপনার মূর্খতার পরিচয় দেয়, এমন নহে; অথবা সে কেবল অলীক কথা বলিয়া আপনার রসনাকে কলঙ্কিত করে, এমন নহে, প্রাচীন ভারতের যাহা সর্ব্বপ্রধান গৌরব তাহার প্রতি সে কুঠারাঘাত করে।

যে নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, যে নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন;—সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন, ইহ জীবনেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন,—যে নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে তাঁহারা অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগৎকে পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ অপেক্ষা স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতররূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকে অম্লানবদনে বলিতেছে "নিরাকার ব্রহ্মধ্যান আধুনিক ব্যাপার, নিরাকার ব্রহ্মধ্যান অসম্ভব ব্যাপার!"

যে তপোনিষ্ঠ পূতচরিত্র মহর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিদেশে সরস্বতীতীরে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই গম্ভীর বাক্য উচ্চারণ করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত ও পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, "আত্ম-ক্রীড় আত্ম-রতি ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" * এই সুগভীর মহান্ উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করি, এখন যাঁহারা নির্লজ্জভাবে জগতের সম্মুখে প্রচার করিতেছেন যে, শাস্ত্রে

* যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রতি করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন, তিনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নিরাকার উপাসনার কথা নাই, পুতুল পূজাই ভারতের চির-সম্পত্তি, তাঁহারা কি যথার্থই সেই সকল পূজ্যপাদ আর্য্য পিতৃ-পুরুষদিগের বংশ-সম্ভূত? যথার্থই কি তাঁহারা সেই সকল মহাপুরুষদিগের সন্তানপরম্পরা? শোক-তাপ, দুঃখ দারিদ্র্য, মোহ কোলাহল হইতে বহু দূরস্থিত দেবলোকবাসী আর্য্য পিতৃপুরুষগণ! আপনারা যদি একবার এই অজ্ঞান অধোলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন, 'ধিক্; শতধিক! পবিত্র আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহারা সেই সত্য-স্বরূপ পরম দেবতাকে জানিতে পারিল না! সেই অতীন্দ্রিয় মহান্ পুরুষের অরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিল না! হায়! আর্য্য-সন্তান হইয়া বলিতেছে, নিরাকার পরব্রহ্ম, ধ্যানের গম্য নহেন! ধিক্! শতধিক্!''

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমর্থিত হইয়াছে কিনা, যাঁহারা যথাথই জানিতে চান, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি, উপনিষদ্ পাঠ করুন। একাদশ খানি উপনিষদ্ অমূল্য সত্য-রত্নের ভাণ্ডার। বেদের শিরো-ভূষণ উপনিষদ্ পাঠ করুন। আমি যতদূর জানি তাহাতে আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, পরমাত্মার স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ বিষয়ে উপনিষদে যেমন চমৎকার উপদেশ আছে, এমন আর কোথাও নাই। পরের মুখে ঝাল খাইবেন না। মনে করুন, শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রকার বলিলেন, আমি এক প্রকার বলি-লাম, আর এক ব্যক্তি আর এক প্রকার বলিল আপনারা

কোন্‌টা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন? তাই বলি পরের মুখে ঝাল খাইবেন না। নিজে উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে কি আছে।

এ ব্যক্তি কি বলিল, ও ব্যক্তি কি বলিল, সে বিষয়ে মন না দিয়া নিজে শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখুন, তাহাতে কি আছে। আমাদের কথা শুনিবেন না; আমরা কে? কোন্ ছার? প্রাচীন, মান্য টীকাকারগণ শাস্ত্রার্থ কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই দেখুন। বুঝিতে পারিবেন, ব্রহ্মোপাসনা আর্য্য-শাস্ত্র-সিদ্ধ কিনা, উহা একটা আধুনিক ব্যাপার, একথা সত্য কি না? আবার বলি পরের মুখে ঝাল খাইবেন না;—কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ-সমর্থন বা দল-বিশেষের পুষ্টি-সাধন করিতে গিয়া আপনার পরমার্থ খোয়াইবেন না।

মহর্ষিগণ উপনিষদে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।

পরমেশ্বরের উপাসনা কেমন ভাবে করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন;—

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে।

মহর্ষিগণ প্রেমের সহিত পরমাত্মার উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছেন।

আবার দেখুন;—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ যাঁহার এই মহিমা ভূলোকে ও দ্যুলোকে, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ধীরেরা তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

পুতুল গড়িয়া পরমেশ্বরকে দেখিতে হইবে, মহর্ষিগণ উপনিষদে এমন কথা বলিতেছেন না।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা"

জ্ঞানদ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে দর্শন করেন।

যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে সাকার উপাসনা ভিন্ন নিরাকার উপাসনার উপদেশ নাই, তাঁহারা দেখুন বেদের শিরোভূষণ উপনিষদ্ কি উপদেশ দিতেছেন।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণাবা জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

আর্য্যশাস্ত্রে কি সাকার উপাসনা ভিন্ন নিরাকার সাধনের কথা নাই? এমন ভয়ানক মিথ্যা কথাও আর নাই।

আবার দেখুন, মহর্ষিগণ কি বলিতেছেন;—

অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌজহাতি।

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা

অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় বচন কত বলিব? আপনারাই বা কত শুনিবেন? তাই আবার বলি, প্রাচীন শাস্ত্র নিচয়, বিশেষতঃ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করুন। এক্ষণে পরিবর্ত্তনের যে মহাবন্যা আসিয়াছে, তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ সকলই ভাসিয়া যাইতেছে। মন্দ ভাসিয়া যায়, যাক্, দুঃখ নাই। কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহা কিছু ভাল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন ভাসিয়া না যায়;—ব্রহ্ম-সাধনরূপ অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি যেন ভাসিয়া না যায়।

আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। এক গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগিয়াছে। গৃহস্থ প্রাণভয়ে পরিবারবর্গকে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যাইতে লাগিল, কি করিবেন উপায় নাই। এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে, তাঁহার পরলোকগত পিতার লাঠি ভিতরে রহিয়াছে, শীঘ্রই দগ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি ঐ লাঠিগাছটী ভক্তি-ভাজন পিতার স্মরণার্থ এতদিন যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। পিতার লাঠি পুড়িয়া যাইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "আমার শাল, দোশালা, কোম্পানির কাগজ সব দগ্ধ হইয়া যাক্, কিন্তু আমি আমার বাবার লাঠি রক্ষা করিব।" অমনি তিনি অগ্নির ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যদিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; শরীর ঝলসিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই;

অসামান্য উদ্যমের সহিত পিতার লাঠি বাহির করিয়া আনিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

আমরা কি আমাদের "বাবার লাঠি"—পিতৃপুরুষদিগের ব্রহ্ম-সাধনরূপ অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিব না? যত্নের সহিত তাহা অধিকার ও উপভোগ করিতে পারিব না? মুক্তির যে একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ তাঁহারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, চক্ষু থাকিতে কি তাহা দেখিয়া লইতে পারিব না? ইহাও যদি না পারি, আর্য্যবংশে জন্ম বলিয়া আমরা এত গৌরব করি কেন? আর্য্যশোণিত এখনও আমাদের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে কেন?

ব্রহ্মোপাসনা কি কেবল সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম?

প্রাচীন তন্ত্রের লোকে আর একটি আপত্তি উপস্থিত করেন;—ব্রহ্মোপাসনা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। যদি ব্রহ্মোপাসক হইতে চাও, স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দরে বা নিবিড় জঙ্গলে যাও; ঋষি-মুনিরা স্ত্রীপুত্র পরিবারের মায়া ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন-প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণাদ্বারা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিবাহ করিবে, সন্তানাদি হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিবে, সকলই করিবে, অথচ ব্রহ্মোপাসক হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব হয়?

কে বলিল যে, ব্রহ্মোপাসনা গৃহস্থের ধর্ম্ম নয়? হিন্দুশাস্ত্রে যিনি বিশ্বাস করেন, এমন কথা তিনি কখনই বলিতে

পারেন না। এবিষয়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্র কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

ঋষি মুনিরা কি সকলে সন্ন্যাসী ছিলেন? কে বলিল? বাস্তবিক এ বিষয়ে সাধারণের একটি বিষম ভ্রান্তি আছে। লোকে মনে করে যে, আর্য্য মহর্ষিগণ সংসার-ত্যাগী ছিলেন। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কি বলিতেছে? মহর্ষিগণ সন্ন্যাসী ছিলেন? কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র কেন? প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য কি বলিতেছে? ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা, ঋষিকুমার, এই সকল শব্দ কি সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না? ঋষিরা কেহ সংসারত্যাগী ছিলেন না, এমন বলিতেছি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি যাঁহারা প্রধান প্রধান, তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার করিতেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিদিগের মধ্যে একজন প্রধান। তাঁহার নাম কোন্ হিন্দুসন্তান না শুনিয়াছেন? যাজ্ঞবল্ক্যের একটি নয়, দুটী স্ত্রী ছিল;—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। উপনিষদে আছে, তিনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

এস্থলে অনুষঙ্গক্রমে একটি কথা বলি। এখন সকলেই মনে করেন যে, স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বলিয়া থাকেন, "স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ-

শূদ্রানাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা” স্ত্রীলোক, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নাই। ইহা নিতান্তই অমূলক কথা। বেদের শিরোভাগ উপনিষদেই রহিয়াছে যে, স্ত্রীলোকে স্বামীর নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন।

সে যাহা হউক, মহর্ষিগণ অনেকেই যে, গৃহস্থ ছিলেন তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের কোন এক জন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করুন; “মহাশয়! আপনার কোন্ গোত্র ?” “শাণ্ডিল্য গোত্র।” আর একজনকে জিজ্ঞাসা করুন, “আপনার কোন্ গোত্র ?” “ভরদ্বাজ গোত্র।” কেহ বা বলিবেন, “কাশ্যপ গোত্র।” গোত্র অর্থ কি ? গোত্র অর্থ বংশ। জিজ্ঞাসা করি, ঋষি মুনিগণ গৃহস্থ ছিলেন না, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ছিল না, তবে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণ কেমন করিয়া তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন ? যদি বল ঋষি মুনিগণ গৃহস্থ ছিলেন না, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যায়। ঋষিদিগের বংশে জন্ম বলিয়াই

---

* যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে যুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রণ্যেন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া, যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। ইত্যাদি অনেক শ্লোকে গার্গি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বেদের কোন কোন অংশ কোন কোন আর্য্যমহিলার রচিত। অক্ষয়কুমার বাবুর উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিভেদ বিষয়ক বক্তৃতা দেখুন।

এখনকার ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণত্বের উপর দাবি। আর যদি বল যে, তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিবে যে, গৃহস্থের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার নাই?

জনক রাজার কথা সকলেই জানেন। ইনি ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদের এক একটি ক্ষুদ্র সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহাঁকে প্রকাণ্ড রাজ্যরূপ একটী প্রকাণ্ড সংসার চালাইতে হইত। অনেকে মনে করেন যে যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ হইবেন, রাজনীতির সহিত তাঁহাদের কোনরূপে সংস্রব থাকিবে না। যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ভগবানের ধ্যান ধারণাতেই কালাতিপাত করিবেন; রাজনীতির সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। জনক, রাজা ছিলেন,—মূর্ত্তিমান রাজনীতি ছিলেন, অথচ তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে মহর্ষি শুকদেবের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, রাজর্ষি জনককে গুরুতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, অথচ তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে। এই সংশয় অপনোদনের জন্য শুকদেব জনকের নিকট গমন করিয়া বলিলেন;—রাজর্ষি! আপনাকে এত বড় রাজ্যের গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হয়, অথচ আপনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গণ্য, এ উভয়ই কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমাকে বুঝাইয়া দিন।”

জনক বলিলেন, “আপনাকে তাহা বুঝাইয়া দিব; কিন্তু

আপনি প্রথমে আমার এই প্রাসাদের সকল স্থান দেখিয়া আসুন। আমি এই প্রাসাদকে অতি সুন্দর করিয়া সজ্জিত করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সুসজ্জিত প্রাসাদ দর্শন করুন।"

শুকদেব প্রাসাদ দর্শনে যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে জনক বলিলেন, "দেখুন, অমনি গমন করিলে হইবে না; একটি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া যাইতে হইবে। জনক, শুকদেবের হস্তে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র প্রদান করিয়া বলিলেন যে, উহার এক বিন্দুও তৈল যেন পতিত না হয়। শুকদেব উহা লইয়া প্রাসাদ দেখিতে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাসাদ দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলে, জনক শুকদেবকে বলিলেন, "মহর্ষি! কেমন দেখিলেন?" শুকদেব প্রাসাদের শোভা ও সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। "তৈল পড়ে নাই তো?" শুকদেব বলিলেন, "না, এক বিন্দুও না। কিন্তু আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন যে, আপনি গুরুতর রাজকার্য্যে মন দিয়াও কেমন করিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিতে পারেন।" তখন জনক বলিলেন মহর্ষি! আপনি যেমন প্রাসাদের সকল স্থান দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন, অথচ তৈলপূর্ণ পাত্রের প্রতি মন রাখিলেন, আমিও সেইরূপ সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি, অথচ ভগবানের প্রতি মন রাখি।"

জনক ও শুকদেব সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি গল্প আছে। এক দিবস জনক ও শুকদেব উভয়ে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলো-

চনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে মায়াতে হঠাৎ বোধ হইল যেন রাজবাটীতে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়াছে। শুকদেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও দৌড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। জনক বলিলেন "মহর্ষি! আপনি কোথায় যাইতেছেন?" শুকদেব বলিলেন, "মহারাজ! দেখিতেছেন না, রাজবাটীতে আগুন লাগিয়াছে? আমি আমার বহির্ব্বাস রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছি।" জনক বলিলেন, "সে কি মহর্ষি! আমার এমন সুন্দর প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহা গ্রাহ্য করিলাম না, আর আপনি সামান্য বহির্ব্বাসের জন্য ব্যস্ত হইলেন?"

এই দুটি গল্পে দুটি সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ সহস্র সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ভগবানে চিত্ত সমর্পিত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একজন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও অন্তরে প্রকৃত বৈরাগী হইতে পারে, আর একজন বাহিরে বৈরাগী হইয়াও, অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল আপত্তির সমালোচনা করিলাম, সে সকল আপত্তি প্রায়ই প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুর মুখে শুনা যায়। এখন আর এক জনের যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে। ইনি কে? ইনি উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্ত যুবা।

উপাসনা ও নিয়ম।

আলোকপ্রাপ্ত যুবার প্রধান আপত্তি এই যে, জগতের সমুদয় ব্যাপার নিয়মানুসারে চলিতেছে। ভৌতিক, শারী-

রিক ও মানসিক, মনুষ্য এই ত্রিবিধ নিয়মের অধীন। নিয়ম পালনেই মঙ্গল; নিয়ম লঙ্ঘনে অমঙ্গল। তবে ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন কি? ব্রহ্মোপাসনায় ফল কি? চক্ষু মুদিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা কোন একটা উপকার জনক কার্য্য কর না কেন?

উপাসনা কি নিয়ম ছাড়া? যাঁহারা বলেন, নিয়ম পালনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, নিয়ম লঙ্ঘন পাপ, সুতরাং উপাসনায় কোন ফল নাই, তাঁহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, উপাসনা জগতের কোন্ নিয়মের বিরোধী? ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক যে সকল নিয়ম আছে, উপাসনা করিলে তন্মধ্যে কোন্ নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মোপাসনা কোন নিয়মের বিরোধী না হইলেই যে উহার অনুষ্ঠান মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্যকার্য্য হইল, এমন নহে। উপাসনা করিলে কোন্ নিয়ম প্রতিপালন করা হয়, কোন্ নিয়মের অনুগত হইয়া চলা হয়, ইহাই প্রদর্শন করা আবশ্যক।

আমি তাহাই প্রদর্শন করিব। মানব-প্রকৃতির ভিতরে এই একটি নিয়ম সকলেই দেখিতে পান যে, মানুষের মন যে প্রকার বিষয়ের সংস্রবে আসে, সেইরূপ ভাবপ্রাপ্ত হয়। জল যেমন, যে প্রকার পাত্রে রক্ষিত হয়, সেইরূপ স্বভাব লাভ করে,—নির্ম্মল পাত্রে নির্ম্মল থাকে, সমল পাত্রে সমল হইয়া যায়, মনও সেইরূপ ভাল বিষয়ের সংস্রবে থাকিলে ভাল থাকে, মন্দ বিষয়ের সংস্রবে থাকিলে মন্দ হইয়া যায়।

সাধু সংসর্গে এত উপকার কেন? উহাতে মন সদ্বিষয়ের সংস্পর্শে আসে বলিয়া। জীবন চরিত পাঠে এত উপকার কেন? মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনের মহৎ কার্য্য ও মহৎ ভাব সকলের সহিত আমাদের মন সংস্রবে আসে বলিয়া। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে উপকার হয় কেন? গ্রন্থনিহিত সদ্ভাব নিচয়ের সঙ্গে মনুষ্যের মন সংশ্লিষ্ট হইয়া যায় বলিয়া।

যদি ইহাই একটি মানসিক নিয়ম হইল যে, মনুষ্যের মন যেমন বিষয়ের সংস্রবে আসে, সেইরূপ হইয়া যায়,—নীচ, অপবিত্র বিষয়ের সংস্রবে আসিলে নীচ ও অপবিত্র হইয়া যায়, এবং মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের সংস্রবে আসিলে মহৎ ও পবিত্র হয়,—তবে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার তুল্য পবিত্র ও মহৎ আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার সংস্রবে আসিলে মন মহৎ ও পবিত্র হইবে না কেন? যিনি পবিত্রতার অনন্ত উৎস, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বর, তাঁহার সহবাসে পবিত্র হইব না কেন? 'কীটস্য কীট' মনুষ্যের মহত্ত্ব পাঠে মন মহদ্ভাবে যদি পূর্ণ হয়, তবে মহত্ত্বের অনন্ত সাগরে নিমগ্ন হইলে মহত্ত্ব লাভ হইবে না কেন?

যদি গুরুজনের সঙ্গে থাকিলে দুষ্প্রবৃত্তির বল হ্রাস হয়, তবে যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরম গুরু তাঁহার সঙ্গে থাকিলে পাপাসক্তি নিস্তেজ হইবে না কেন? তাঁহার তুল্য পবিত্র, তাঁহার তুল্য মহৎ, তাঁহার তুল্য গুরুজন আর কোথায় পাইব? কে বলে ব্রহ্মোপাসনা নিয়ম-বিরুদ্ধ?

উপাসনা ও নীতি।

আলোকপ্রাপ্ত যুবার আর একটি আপত্তি এই যে, নীতি-পরায়ণ হইলেই ত হয়; পরস্বাপহরণ করিও না, প্রবঞ্চনা করিও না, ব্যভিচার করিও না, অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও মনে ক্লেশ দিও না, যথাসাধ্য পরোপকার কর, ইহা হইলেইত হইল। নীতিপরায়ণ হও, উপাসনা আবার কেন?

নীতিপরায়ণ হইতেই হইবে যথার্থ কথা, সেই জন্যই পরমেশ্বরের উপাসনা করি। উপাসনা যেমন সাধু প্রবৃত্তি সকলকে বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীকৃত করে, এমন আর কিসে করিতে পারে?

যদি চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া ও হৃদয়কে প্রেমার্দ্র করিয়া জগতের নরনারীগণকে পবিত্র প্রেম নয়নে দেখিতে চাও, যদি আপনার দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক, সংসারের বিপদ সঙ্কুল পথে অদম্যবলে চলিতে চাও, যদি পশুভাবকে পদতলে বিদলন পূর্ব্বক, দেবভাবকে সমুজ্জ্বল করিয়া মানব জীবনের মহদুদ্দেশ্য সংসাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে অনন্ত মঙ্গল-ভাব, প্রেম, পবিত্রতা সমন্বিত পূর্ণ শক্তি পরম দেবতার চরণা-শ্রয় গ্রহণ কর,—তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন কর, তাঁহারই বিশুদ্ধ স্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হও।

উপাসনা কি? পরমেশ্বরে প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করাতেই কি উপাসনা হয় না? ইহাই যদি হইল তবে উপা-সনাবর্জ্জিত নীতি অথবা নীতিবর্জ্জিত উপাসনা কেমন

করিয়া সম্ভব হইবে? পিতা মাতাকে প্রীতি ও ভক্তি করা, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি নীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে? তবে যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতা মাতা, তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করা কি নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য? উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যদি নীতি হয়, তবে জীবের পক্ষে যাঁহার তুল্য উপকারী আর কেহ নাই, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি নীতি বিগর্হিত কার্য্য? যদি এমন কোন নীতি শাস্ত্র থাকে, যাহা পিতা মাতাকে ভালবাসিতে ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে নিষেধ করে, তবে সেই নীতি শাস্ত্রই বলিতে পারে, জগতের পিতা মাতাকে ভক্তি করিও না, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইও না।

যিনি আসল মাতা, যিনি স্নেহরূপে মাতৃ হৃদয়ে অবতীর্ণ না হইলে, মাতা আমাকে ঘৃণিত মাংসপিণ্ড জ্ঞানে শ্মশানে নিক্ষেপ করিতেন, তাঁহার প্রতি কি মাতৃভক্তি শিক্ষা করিব না? যে নীতি বলে, পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্ হওয়ার প্রয়োজন নাই, সুতরাং জগতের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শিক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে, এমন নীতি যত শীঘ্র জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। মাতৃভক্তি বিহীন অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডের আবার নীতি কি?

নীতি ও ধর্ম্ম কি ভিন্ন? পার্থিব মাতার প্রতি ভক্তি, ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, উভয়ই ভক্তি, একই পদার্থ কেবল পাত্রভেদে নাম ভেদ, একটির নাম নীতি, আর একটির নাম ধর্ম্ম।

আর এক ভাবে দেখিলেও নীতি ও ধর্ম্ম অভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইবে। নীতি যাঁহার আদেশ, ধর্ম্ম তাঁহারই আদেশ। যে বলে নীতি ও ধর্ম্ম ভিন্ন, সে ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে বলে নীতি ইহকালের জন্য, ধর্ম্ম পরকালের জন্য, সে ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ। একই পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত গঙ্গা ও যমুনা, যেমন প্রয়াগ তীর্থে একত্র মিলিত হইয়া সাগর সঙ্গমে ধাবিত হইতেছে, সেইরূপ পবিত্র পরমেশ্বর হইতে বিনিঃসৃত নীতি ও ধর্ম্ম, ইহজীবনরূপ পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে একত্রীভূত হইয়া অনন্ত জীবন সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

উপাসনা ও তোষামোদ।

এখন আর একটি কথার উত্তর দিতে হইবে। নব্য তন্ত্রের কেহ কেহ বলেন, "পরমেশ্বর কি মানুষের মত তোষামোদ ভালবাসেন? ধনশালী বাবুর চতুঃপার্শ্বে পার্শ্বচরগণ উপবিষ্ট হইয়া বাবুর রূপযৌবন, খ্যাতিসম্ভ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় যখন বর্ণনা করিতে থাকেন, বাবুর হৃদয়ে তখন আনন্দ ধরে না; যথোপযুক্তরূপে মধুরভাষী অনুচরগণের সন্তোষ সাধন করেন। পরমেশ্বর কি সেইরূপ মানুষের মত? তিনি কি তাঁহার আরাধনা ও গুণ-কীর্ত্তনে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন? অনন্ত পরমেশ্বর অস্মাদের তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়া যান, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে?"

উদ্যানে যে সুন্দর গোলাপটী ফুটিয়াছে, উহা দেখিয়া কি

তুমি মনে মনে বা মুখে বলনা, "গোলাপ! তুমি কেমন সুন্দর!" সরোবরে যে মনোহর কমলদল বিকসিত হইয়াছে, তাহার প্রতি নয়নপাত করিয়া কি বলনা, "শতদল! তুমি কেমন মনোহর!" পৌর্ণমাসী রজনীতে সুধার্ণবে ব্রহ্মাণ্ড ভাসাইয়া যখন পূর্ণ সুধাকর সুনীল আকাশে প্রস্ফুটিত হয়, তখন কি বলনা, "সুধাকর! তোমার কি নিরুপম সৌন্দর্য্য! তোমাকে দেখিলে তাপিত চক্ষু শীতল হয়!"

গোলাপ ও কমলফুলের তোষামদ কর কেন? তাহারা কি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার কিছু উপকার করিবে? পূর্ণচন্দ্রের তোষামোদ কর কেন? চন্দ্রদেব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, চন্দ্রলোক হইতে মনি অর্ডার করিয়া কি তোমাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিবেন? তোষামোদ নয়; মানবহৃদয় স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে।

কিন্তু জড়ীয় সৌন্দর্য্য ভিন্ন কি আর সৌন্দর্য্য নাই? বীর-হৃদয় মহাপুরুষ পর্ব্বত সমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিলে কি তোমার হৃদয় স্বভাবতঃ তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করে না? জননীস্বরূপা জন্মভূমির জন্য, স্বদেশ-প্রেমী আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া কি তুমি বিমুগ্ধ হওনা? দরিদ্র-বৎসল হৃদয়বান্ ব্যক্তির সস্নেহ হস্ত অনাথ শিশুর মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া কি তোমার প্রাণ মন বিগলিত হয় না? বন্ধু বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত দেখিলে তুমি কি সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় বন্ধুতার নিরুপম সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে

পার না? পতিপ্রাণা সতী প্রিয়তম পতির মঙ্গল সাধনে মৃত্যুকে পর্যন্ত তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছে দেখিলে কি তোমার হৃদয় আপনা আপনি বলিয়া উঠে না "আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

প্রকৃত বীরত্বের সৌন্দর্য্য, স্বদেশ-বাৎসল্যের সৌন্দর্য্য, নিঃস্বার্থ পরোপকারের সৌন্দর্য্য, অকৃত্রিম বন্ধুতার সৌন্দর্য্য, অনুপম দাম্পত্য-প্রণয়ের সৌন্দর্য্যের নিকট গোলাপ কি কমল কি চন্দ্রের শোভা কোন্ ছার! চরিত্রের শোভা, আধ্যাত্মিক শোভার তুলনায় জড় প্রকৃতির শোভা কোথায় থাকে! যদি জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য কখন অনুভব করিয়া বিমোহিত হইয়া থাক—সেই নিরাকার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাক,—তবে সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ মঙ্গল, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলে কি মুগ্ধ হইয়া অবাক্ হইয়া থাকিবে না? সাধক যখন ব্রহ্ম-স্বরূপের অবর্ণনীয় অরূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া বলেন, "তোমার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার উপমা নাই; তোমার অতলস্পর্শ সৌন্দর্য্যসাগরে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ডুবিয়া গেল," তখন কি তিনি তোষামোদ করেন? এমন কথা যে বলে তাহার তুল্য অন্ধ আর কে আছে?

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যাহার হৃদয় স্বভাবতঃ তাহার প্রশংসা করে না, তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, পরমেশ্বরের আরাধনা তোষামোদ নহে? তর্ক করিয়া কি বুঝান যায়? তর্ক নয়; চিকিৎসা চাই। হৃদয়ের রোগ না

জন্মিলে কেহ কখন ওরূপ কথা বলিতে পাবে না। বোগের চিকিৎসা আবশ্যক। হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইলে মানুষ আপন আপনিই সকল বুঝিতে পাবে।

পবমেশ্বর কি আমার কথায় ভুলিয়া কাজ কবেন? যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অসীম ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তিনি কি এই ক্ষুদ্র কীটের কথায় বিচলিত হন?—যে ঈশ্বব আমাব মিষ্ট কথায় ভুলিয়া যান, আমার অনুবোধে কাজ কবেন, আমি এমন ঈশ্বরের উপাসনা করি না। যাঁহাব অনন্ত জ্ঞান-প্রণোদিত অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা, এই বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থকে নিয়মিত কবিতেছে, তিনি কি আমাব কথা শুনিয়া কাজ করেন? সর্ব্বত্রই তাঁহাব নিযম কার্য্য কবিতেছে। আমাব আরাধনায় তিনি উপকৃত হন না,আমি নিজে উপকৃত হই,—তিনি বিচলিত হন না, আমার পাপাসক্তি বিচলিত হয়। উপাসনা তাঁহাবই নিয়ম,—আবাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সকলই তাঁহার নিয়ম।

আত্মার তৃপ্তি কোথায়?

সেই পরাৎপর সত্য পুরুষেব সাক্ষাৎ পূজা করিয়া কৃতার্থ হও। আসল থাকিতে নকল কেন? সত্য থাকিতে কল্পনা কেন? আলোক থাকিতে অন্ধকাব কেন? আমবা কি এতই হতভাগ্য যে, সেই সারাৎসাব পরম পুরুষকে না পাইয়া মাটীর পূজা করিয়া মাটী হইব? একান্ত মনে যে তাঁহাকে ডাকিতে

পারে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ্‌কার মহর্ষি বলিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো—
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমে বৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম ॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

অনন্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন মানবাত্মা আর কিছুতেই চিরশান্তি লাভ করিতে পারে না। একজন সাধক বলিয়াছেন যে, যে প্রকাণ্ড তিমি অকূল-সাগরে আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাকে যদি তোমার ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে আনিয়া ফেল, তাহাতে কি সে সুখী হইবে? যে শ্যেন পক্ষী স্বাধীনভাবে অক্লান্ত পক্ষে অসীম প্রসারিত গগনে উড্ডীন হয়, পিঞ্জরবদ্ধ হইলে কি সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? সোণার পিঞ্জর কেন হউক না, গগনবিহারী বিহঙ্গমের তাহাতে সুখ কি?

যে তিমি সেই অনন্ত অমৃত-সাগরে মগ্ন থাকিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সে কি ইহ সংসারের ক্ষুদ্র পল্বলে কখন সুখী হইতে পারে? যে অমর পক্ষী অনন্ত অধ্যাত্ম আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া মধুর স্বর্গীয় সংগীত বর্ষণ করিবার জন্য জন্ম

গ্রহণ করিয়াছে, ইহ সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে সে কেমন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবে? "যোবৈভূমা নাল্পে সুখমস্তু।"

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যে ব্যক্তি মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হয়, সুখস্বপ্নে যে স্থায়ী সুখ লাভের আশা করে, সে ক্রন্দন করিবে না তো কে করিবে? অটল পর্ব্বত সম্মুখে থাকিতে যে চঞ্চল বালু ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে, অমৃত সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া যে তপ্ত বালুকায় তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যায়, তাহার চক্ষে নৈরাশ্যের অশ্রু দৃষ্ট হইবে না তো আর কোথায় হইবে? কাচ খণ্ডকে হীরক জ্ঞানে অতি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেছ, উহা পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছ। যাহা সার [illegible] যাহা স্থায়ী, যাহা ইহ সংসারকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত পরলোকে পরিব্যাপ্ত, সেই পদার্থকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে না ধরিলে এ হাহাকার আর কিছুতেই ঘুচিবে না। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পদারবিন্দের মধু পান না করিলে আর কোথায়ও পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি পাইবে না। সকলে বল, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং," "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং," "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"।